একগেরস্থর তিন সংশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭১

প্রকাশক : শ্রীঅরুণকান্তি ঘোষ
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কোলকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রী সাধন চক্রবর্তী, নবীন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৩, ডাঃ কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট কোলকাতা ৯

রোজ রাতে আলো নিভলেই খুটখাট শুরু হয়ে যায়। গরমে মশারি টানানো অসম্ভব। বীরেন আর রাধার মাথার কাছেই ফ্রিজ। তার ওপর উঁচুতে দেওয়ালে বীরেনের মা বাবার ছবি। পায়ের কাছে বইয়ের বুকর‍্যাক। র‍্যাকের মাথায় টেলিফোন। জলের জগ। উপুড় করে দাঁড় করানো গ্লাস। পাশের ঘরে বীরেনের ছোট ছেলে একা একা শোয়। শুকতারা পড়ে। রাত পৌনে দুটোয় কারেন্ট চলে গেল। সেই সঙ্গে খুটখাট। কলকাতার একতলা ভাড়াবাড়ি সামান্য চাঁদের আলো এসে ঢুকে পড়লো। বীরেন স্পষ্ট দেখতে পেল—একটি ধেড়ে ছুঁচো ফোনের রিসিভারের পাশে বসে দুই কুচি নীল চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সন্ত মধ্যবয়সী বীরেন। বড় ছেলেটির গোঁফ উঠেছে। আই আই টির—হোস্টেলে থেকে পড়ে। খুব রেগে রেগেই উঠলো বীরেন। তারপর এক ধমকে ছুঁচোটাকে নীচে নামাতেই সে জানালার শিক গলে। ভেবেছিল—একটা লাঠি থাকলে। ঠিক পিঠের শিরদাঁড়ায়। রাধার এক কাতে শোওয়া অভ্যেস। খাটের নিচের মশাগুলো ওর গায়ের রক্ত। তবু রাধা ওদিকেই। বীরেন চেঁচিয়ে উঠলো। কতদিন বলেছি—আলুর চপে কোন বিষ দিয়ে নর্দমার।

রাধা সে চিৎকারে ফিরে ও। যেমন ঘুমোচ্ছিল—তেমনি।

যেদিন মাঝরাতে জেগে উঠেছে বীরেন—সেদিনই এই খুটখাট। কিংবা এই খুটখাট তাকে জাগিয়ে। একদিন তো বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলের ডগায় দাঁত বসাচ্ছিল। জেগে গিয়ে বীরেন কোন ডিসটার্ব করেনি। চুপ করে অপেক্ষা। বেড স্যুইচ টিপে সে আস্তে রাধাকে। ওঠো। বোধ-হয় সাপে—।

কী বলছো।

পায়ের দিকটায়।

দেখি। হ্যাঁ। এ যে রক্ত—

বীরেনও উঠে বসে দেখেছে। শেতল পাটির ওপর। দু ফোঁটা।

. বাঙুর হাসপাতালে টকসাইড ইঞ্জেকসন। ওরাই বলে দিল, পাস্তুরে

ডাক্তার মোদকের কাছে গিয়ে। আর এক মাসের মাথায় আরেকটা টকসাইড। মনে করে দিয়ে যাবেন।

পাস্তুরে মোদক। হেসে বললো, ইঁদুর নয়তো ছুঁচো। ডোমেসটিকেটেড্। কোন ভয় নেই। ওখানেই কথায় কথায় বীরেন জানলো পাস্তুরে বছরে ১৮০০ ভালো জাতের ভেড়া জবাই হয়। রক্ত লাগে। চিকিৎসার জন্যে। বিজ্ঞানের জন্যে। বিশেষ করে জলাতংকের।

বীরেনের তখনই অনেকদিন আগে এক ঝড়ের বিকেলে দেখা। সিঁথি ছাড়িয়ে। রিক্‌সা সাইকেল থেকে নেমে। ধুলোর ঝড়। একটা বেআক্কেল সাইজের ঢাউস গোহাল। গোটা সতেরো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। রোজ মোটা সিরিঞ্জে। সাকুল্যে আড়াই বালতি রক্ত। ভ্যানে উঠে। হুস্—

মশা। ইঁদুর। ছুঁচো। পাগল হয়ে গেলাম রাধা।

রাধা যেমন—তেমনই। ইদানীং বীরেনের একটা দৃঢ় সন্দেহ টোম্বল হয়ে। তার বিশ্বাস—তলপেট থেকে অনেক কিছুই নিচের দিকে আগের চেয়ে পেশি ঝুলে। তাই কি প্রায়ই পেচছাপ চাপে? কে জানে? শরীর একটি সিনেমা হল। কোথায় কোন্ ফ্লাশ। অন্ধকার হয়ে গেলে টর্চ একটা খুব।

বীরেনদের বাথরুমে নালী পাতালের সঙ্গে। মাথার ওপর সাওয়ার। মাঝখানে আরেকটা কল। বীরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুট করে সুইচ টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোর খরখরে সব শুয়ো বীরেনের চোখে। আর অমনি কলকাতার পাতালের সঙ্গে সরাসরি যোগ—এই নালী বেয়ে পিল পিল করে—

আটচল্লিশ অব্দি গুনলো বীরেন। পেচছাপ হয়ে গিয়েছিল। আরও একটা। মোট প্রায় পঞ্চাশ। ছোট বড় সব আরসোলা। এর ভেতর আবার একটা শাদা। এখনো দুটো আরসোলা নালীর মাথায় বসানো লোহার ঝাঁঝরির ফোকর দিয়ে পাতাল থেকে উঠে আসছে।

বীরেন দত্তগুপ্ত জানে—এই পাতাল আসলে কলকাতার পাতাল।

যার ওপরের মলাট কলকাতার পিচরাস্তাগুলো। শ-দেড়েক—পৌনে দু-শ বছর ধরে একটু একটু করে এই মলাট তৈরি হয়েছে। জব-চার্ণকের তিনখানা গাঁ থেকে মহানগরী নামটা পেতে যা সময় নিয়েছে —এই পাতালেরও বয়স প্রায় তাই। বীরেনের শরীরের গরম জল পেয়ে নালী থেকে আরও আরসোলা বেরিয়ে আসতে লাগলো। একটা জিনিস তার কাছে পরিষ্কার নয়। আমাদের এই একতলা ভাড়া বাড়ির নালীর সঙ্গে পাতালের কানেকশন কী ভাবে হয়েছে। নালীর মুখ থেকে এই বিশাল পাতালের বুকটা ঠিক ,কতদূরে? বর্ষায় কলকাতা ভাসলে—কিংবা সারা কলকাতার মানুষজন যদি কিছু বেশী চান করে আর হাত পা ধোয়—তাহলে কি পাতালের বুকটা ফুলে উঠে পিচরাস্তা আর একতলা বাড়িগুলোর মেঝের মলাট উপচে বেরিয়ে পড়বে না?

এরকম আরও কয়েকটা গুরুতর প্রশ্ন প্রায়ই বীরেনকে ভাবিয়ে তোলে। ভাবতে ভাবতে সে ঝিমিয়ে পড়ে। এত বড় প্রশ্ন। অথচ তার কতটুকুই বা সে জানতে পেরেছে! চান করতে গিয়ে সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সে ভেবেছে—নিশ্চয় ইংরেজি এস হরফের কায়দায় কোন মোটা নল দিয়ে কলকাতার পাতালের সঙ্গে আমাদের এই নালীর যোগ রাখা হয়েছে। যদি সে নল ইংরেজি আই হরফের কায়দায় হোত—তাহলে পাতালের বুকের যে কোন জোয়ার ঠেলে কলকাতার একতলায় ঢুকে পড়তো।

আলো নিভিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির একমাত্র ফাঁকা বারান্দায় বসলো বীরেন। এ জায়গাটা এ-বাড়ির একমাত্র জায়গা—যেখান থেকে সরাসরি অক্সিজেনের সঙ্গে দেখা হয়। হয়তো বাড়িটার পশ্চিম একদম বন্ধ। উত্তরে বাড়ির পর বাড়ি। দক্ষিণেও তাই। এ-বারান্দা থেকে দিনে সূর্যোদয়, রাতে চন্দ্রগ্রহণ—এমন কি চন্দ্রোদয়ও দেখা যায় সম্ভবত। তাছাড়া এক ধরনের তেরছা বাতাস নানান বাড়ির বাধা টপকে চলে আসে এখানে। বারন্দাটি লাল রঙের। চওড়ায় পাঁচফুট। লম্বা বত্রিশ ফুট। শীতে রোদ পোহানো, শীলাবৃষ্টিতে

শীল কুড়োনো—সবই চলে যায় এ বারান্দায়। কেরোসিন কাঠের একটা বেঞ্চ আছে। তাতে পাশাপাশি বসে কথা বলা যায়—সামনের দেওয়ালে কিংবা একটু উঁচুর আকাশে তাকিয়ে। বারান্দার নিচেই জমাদারের রাস্তা। একদিন বেঞ্চে বসে বীরেনকে কথা বলতে দেখে রাধা বলেছিল—কি? ট্রেনের জন্যে বসে আছো।

অনেকটা সেরকমই ভাবখানা বারান্দাটার। বীরেন হেসে বলেছিল হ্যাঁ। ছ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এখুনি কল্যাণী লোকাল আসবে।

আজ কিন্তু হাসি পাচ্ছিল বীরেনের। বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বললো, ঘুমোচ্ছো কি করে? মশা কামড়াচ্ছে না?

এবারও রাধা কোন জবাব দিল না। বারান্দার লাগোয়া ঘরে ছোট ছেলে সাধন ঘুমোচ্ছিল। সে চেঁচিয়ে বললো, গোলমাল কোরো না বাবা। সারা পাড়া ঘুমোচ্ছে।

কেউ ঘুমোচ্ছে না। সবাই জেগে বসে আছে।

না। ডি সি তো যায়নি। তারা তো ঘুমোবে।

এ বাড়িতে শালা আমি থাকবো না। ছুঁচো। ইঁদুর। আরসোলা। মশা। গরম তারপর ড্রেনের গন্ধ।

এবার রাধা উঠে এলো। ড্রেনে তো গন্ধ থাকতে পারে না।

গন্ধ পাচ্ছি আমি নাকে। নিশ্চয় ছাই দিয়ে বাসন মাজতে গিয়ে ওদিককার ঝাঁঝরি বন্ধ হয়ে গেছে। কতদিন বলেছি পাউডার ইউজ করো।

অসম্ভব। আমি নিজে জমাদার দিয়ে পরিষ্কার করিয়েছি পরশু। নগদ আট টাকা নিয়ে গেল।

তার চেয়ে পাউডার কি সস্তা পড়ে না।

মাঝরাতে চেঁচিও না গাঁক গাঁক করে।

একশোবার চেঁচাবো। কেন তুমি আলুর চপে বিষ দিয়ে ছুঁচোগুলোকে মারোনি?

আছে তো মোটে চারটে।

শুনলে কখন?

রাধা বললো, আমি জানি। ওরাই ডাস্টবিন থেকে আলুর খোসা টোসা টেনে নিয়ে গিয়ে পচিয়েছে নিশ্চয়। তার থেকেই গন্ধ বেরুচ্ছে নর্দমায়।

ঠিক আমার মাথার কাছে রাধা—পচা গন্ধ। নিঃশ্বাস নিলেই পাই। ঘুমোনো যায়?

দিব্যি ঘুমিয়েছো এতক্ষণ। ষাঁড়ের মত নাক ডাকাচ্ছিলে—

রসিকতা ভালো লাগছে না। একটি চড় কষাবো।

তাতো বসাবেই। কেন?

স্প্রে করে আরসোলাগুলো মারোনি কেন? অফিসে যাও না। যেতে হয় না। রান্নার লোক আছে। কয়েকটা কাজ তো করবে রাধা। কম কাজ করি আমি? আমি তোমার বউকে বউ—পিওনকে পিওন।

তাই বুঝি! বীরেন তখনো রাধার শরীরের সে জায়গাটা বেছে দেখছিল মনে মনে—যেখানে একটা চড় কষালে রাধা খুব ব্যথা পাবে না—অথচ বুঝবে—সংসারে বিয়ে নামে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের পার্টনার হিসেবে তারও কিছু করার আছে। উপরন্তু এও বোঝা দরকার সময়েরটা সময়ে না করলে সে কাজের কোন দাম থাকে না। এই বিশ-বাইশ বছরে বীরেন দত্তগুপ্ত শ্রীমতী রাধা দত্তগুপ্তকে এ জিনিসটি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেনি।

তা নাতো কি? ব্যাংকে যাই। বাজার করি। ইলেকট্রিক বিল দিই আমি।

একজন চাকুরে মেয়েকে বেলা সাড়ে ন-টার ট্রামে কীভাবে উঠতে হয় দেখেছো?

তুমি ভীষণ খারাপ লোক।

তা তো বলবেই। আরসোলাগুলোকে মারোনি কেন?

মেরেছি ক-দিন আগে। ওরা এখন আর স্প্রে করলেও মরে না। দীপু বলেছিল, হসটেল থেকে কী একটা নতুন ওষুধ নিয়ে আসবে। তাতে নাকি খুব মরে—

দীনু মানে দীনেশ। খড়গপুর আই আই টি-তে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। তার কথায় বীরেন আর রাধা দুজনই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই প্রথম ওদের বড় ছেলে বাড়ির বাইরে। মাস কয়েক হোল ভর্তি হয়েছে খড়গপুরে। সেখানেও নিশ্চয় কারেন্ট চলে যাচ্ছে। তখন কী করে দীনু? অবিশ্যি নেটের মশারি দেওয়া হয়েছে। খোলামেলা জায়গা। বড় বড় জানলা। হয়তো এখন বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচছে।

রাধা এসে বীরেনের পাশে বসলো। বসে সাধনকে ডাকলো।

এই সাধু। বাইরে এসে বোস। মশায় খেয়ে ফেলবে তোকে।

আমার ঘুম হয়নি। আমি উঠবো না।

গরমে পচবি কেন? বাইরে আয় বাবা।

বীরেনের এ ডাকেও সাধন বাইরে এলো না। বীরেন মনে মনে বললো, অবাধ্য।

রাধা আর বীরেন নিজেদের মধ্যে কোন কথা শুরু করতে পারছিল না। বীরেনের মনে পড়লো, তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল গরমকালে। রাস্তার ওপর এক দোতলায়। সে রাতেও রাধা মোট তিনটি কথা বলেছিল। তার ভেতর দুটো ছিল এইরকম।

বীরেন বলেছিল, আলো নিভিয়ে দি?

হ্যাঁ।

গরম লাগছে? পাখা কাছে আছে—

না।

তোমার নাম কি? বলেও মনে পড়েছিল বাসনের—বিয়ের কার্ডে নাম থাকলেও সব স্বামী একথা জানতে চায়।

রাধা।

সেই রাধা গত বিশ বাইশ বছরে বিশেষ কথা বলেনি। যা দু-চারখানা বলে—তা এখনই বলে। সব কথা স্পষ্ট। নিখুঁত উচ্চারণ। কোনদিন তার সামনে হাঁ করে ভাত খায়নি। হাঁ করে ঘুমোয়নি। নিয়মিত তেল সাবান মাখে। খুব গোপনে উত্তমকুমারকে ভালোবাসে।

রাধা বললো, চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবে ?

সে তুমি ঠিক কর।

হিল স্টেশন খুব কস্টলি।

আমি কিছু টাকা দেব।

দীনুর সেমিস্টারে নশো টাকা দিতে হবে একসঙ্গে। মনে আছে ?

তোমার ছেলে। সে টাকা তুমি দেবে।

তোমারও ছেলে রাধা।

একশোবার। কিন্তু এ টাকা তো আমার জমানো।

তুমি কি আয় করো রাধা ?

বাঃ। আমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটি না এ সংসারের জন্যে ?

সে তো আমিও খাটি রাধা।

সে তো একটু অফিসে যাও।

ওই একটুই তো কতখানি মাথার কাজ—তুমি তো খোঁজ রাখো না। কোন টাকারই অপচয় ভাল নয়। হাতের কাজকর্ম শেষ হোক—তখন অফিসের লিভ-ট্রাভেলের টাকা তুলে বেড়াতে যাবো।

তা আর হয়েছে। কোনদিনই তোমার অফিসের কাজ শেষ হবে না। তুমি আসলে একজন অত্যন্ত খারাপ লোক।

কাজ ফেলে রেখে আমি আনন্দ করতে পারিনে—

আনন্দ করতে তুমি জানলে তো।

সব মেনে নিচ্ছি রাধা। কিন্তু আমি কোথাও রাশ আলগা করিনি বলেই তো আজ আমাদের ছেলে জিওফিজিকসে ভর্তি হতে পেরেছে। তার খরচ আমরা চালাতে পারছি।

এই সব ভেবে ভেবে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যায়।

আমি জন্মে অব্দি টেনশনে আছি রাধা। চলো হেঁটে আসি। এখন বাইরের বাতাস চোখে লাগলে আরাম পাবে।

এত রাতে ?

রাত ফুরিয়ে আসছে এবার। চলো ভিক্টোরিয়ায় যাই। ওদিকটা কলকাতা বলে মনেই হয় না আমার।

খালি হাতে যাবো কিন্তু। হারটাও তুলে রেখে যাচ্ছি। তুমিও ঘড়ি নেবে না সঙ্গে।

বেশতো। কিন্তু অত চিন্তার কিছু নেই। গরমে ফুটপাতে সবাই জেগে।

ধীরেন দত্তগুপ্ত মর্ণিং ওয়াকের কেডস পরে নিয়ে হাফপ্যান্ট পরতে যাচ্ছিল। রাধা বেঁকে বসলো। ওটা পরলে তোমার সঙ্গে আমি যাবো না।

বেশতো ধুতি পরছি মালকোচা দিয়ে। হাফশার্ট।

রাস্তার মাথার ওপর আকাশটা তখনো অন্ধকার। কাগজের ভ্যানের আশায় মোড়ে মোড়ে হকারদের জটলা। ভিক্টোরিয়ার ভেতর পৌঁছে দেখলো, গাছগুলো সব বুড়ো হয়ে গেছে। গায়ের বাকল ফাটা ফাটা। আলো পরিষ্কার হচ্ছিল। রাধা তোমার সঙ্গে প্রায় তেইশ বছর পরে এলাম এখানে।

যাক। আর সাল সন মুখস্থ বলতে হবে না।

আমরা খুলনা জেলা-স্কুলের ছেলে। আমাদের সব মুখস্থ থাকে। একশো তিরিশ পাতার ভূগোল বইটা এই সেদিনও আমার মুখস্থ ছিল।

ভোরবেলার বাতাসে ওরা দুজন অনেকদিন পরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আবছা অন্ধকারে প্রায় চল্লিশজনের এক ফৌজ জ্যামিতির ত্রিভুজ চতুর্ভুজ হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। খানিক দূরে কয়েকটি ঘর্মাক্ত ঘোড়া। সবুজ ঘাস আলোর সঙ্গে সঙ্গে আরও সবুজ হয়ে ধরা দিচ্ছিল।

তোমাদের খুলনা জেলা স্কুলকে তুমি ভুলতে পারো না?

শুধু শুধু ভুলবো কেন? ওয়ার্ল্ডের বেস্ট স্কুল।

ইটন? হ্যারো?

দেখিনি। নাম শুনেছি। কিন্তু ওদের কি দুটো নদী আছে রাধা? আমাদের স্কুলের একদিকে ভৈরব। আরেকদিকে রূপসা।

এই রূপসার গায়েই হস্টেল। বৃষ্টির দিন জানলা দিয়ে দেখা যেত—চাষীরা উবু হয়ে ধান পুতছে।

আর খুলনা?

মস্কো দেখিনি। লণ্ডন দেখিনি। কিন্তু খুলনার মত এত সুন্দর মাটির রাস্তা বোধহয় তারও নেই। শহরের শেষদিকে মাটির রাস্তা ঘাসে ঢাকা পড়ে পড়ে। তবু রাস্তা এগিয়ে গিয়ে শেষমেশ বকুলতলায় হারিয়ে যায়। আরেকটা ঘেঁষের রাস্তা, আঃ।

চুপ করো। তোমার বড্ড আদিখ্যেতা। কী থাকতে পারে একটা রাস্তায়?

বীরেন অবাক হয়ে রাধার মুখে তাকালো। গালে কোথাও কোন দাগ পড়েনি। কনুই আগে কালো হয়নি। আর কবে হবে? শাড়ির পাড় সুতোর ফুলতোলা কাজে ভর্তি। রাধার মাথার পেছনেই স্মৃতিসৌধের ওপরে শাদাটে পাথরের সেই আধখানা বিখ্যাত ধাপ। ভোর এখন আগাগোড়া। রাধার চোখ পুরো ঘুমের আরামে টস টসে।

একটা রাস্তায় অনেক কিছু থাকে।

ফেলে এসেছো তো সেই তিরিশ বত্রিশ বছর আগে।

সেই তখনটা কিন্তু আমার জন্যে চোখের সামনে থমকে থেমে আছে। নদী শহর ছাড়িয়ে গিয়ে একটা শিবমন্দিরের সামনে ভীষণ চওড়া হয়ে গেল—

এখন তো সেখানে চড়া পড়তে পারে।

পারে কিন্তু আমার দেখা নদীতে তো পড়েনি রাধা। শিববাড়ীর মাথায় একটা অশ্বত্থ চারা।

তার মানে সে মন্দিরে পূজো হয় না।

হয়তো হয় না। আমি তো বাইরে থেকে দেখেছি। আরও এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধের সময় তৈরী রুজভেল্ট জেঠি। বড় স্টিমার ভিড়তো।

আমার পায়ে বোধহয় আরসোলা চেটেছে।

কোথায়?

পায়ের পাতার তলার দিকে। আঙ্গুলের ফাঁকে।
বাড়ি ফিরে বেশী করে চুন দিও। কিন্তু রাধা।
তাই হাঁটতে গিয়ে চুলকোচ্ছে—। এসো। বসি এখানটায়।
বহুকাল পরে ওরা পাশাপাশি কোন মাঠে বসলো। পায়ের নিচে পাতি ঘাস। ছোট পিঁপড়ে সেই সব ঘাসকে গাছ জ্ঞানে চড়াই উৎরাই ভাঙ্গছে। বারেন লুকিয়ে দেখলো, রাধার পিঠের খাঁজ এখনো চোখ টানে। দীনু ঠিক ঠিক মত পাশ দিয়ে চাকরিতে বসলে রাধার ছেলের বউ আসতে আর মোটে পাঁচ-ছ বছর। ততদিন যদি ও রকম থাকে—তাহলে আর কি চাওয়ার আছে আমার জীবনে। একথা ভাবতে গিয়ে পাশেই ক্যাসিয়া গাছটার গু ড়িতে চোখ পড়লো বীরেনের। শেকড়গুলো বুড়ো মানুষের হাতের আঙ্গুল। একটা শুকনো ডালকুটি পড়েছিল। সেটা নিয়ে শেকড়ের ভেতর খোচাতেই ধুলো ধুলো মাটি বেরিয়ে এলো অনেকটা। এসব গাছের যত্ন নেই কোন।
বীরেনের একথায় রাধা বললো, অনেকদিনের গাছ। কি আর যত্ন করবে! এখন তো ওর হয়ে আসার সময়।
কি বলছো রাধা? গাছেদের বয়স তুমি জানো? বলতে বলতে বীরেন সেই ডালকুটি দিয়ে খোঁচাতেই গাছের গোড়া থেকে পিল পিল করে উইপোকা বেরিয়ে এলো। সকালের পরিষ্কার আলোয় বীরেনের মনে হচ্ছিল—সব কটা উইপোকার পেটে পিঠে পুঁজ জমেছে। টিপলেই পুট করে গায়ে ছিটে এসে লাগবে। এ পুঁজ আসলে ক্যাসিয়া গাছটার গা থেকে শুষে খাওয়া রক্ত। কিংবা রস।
রাধা বললো, গাছটার বয়স হয়েছে নিশ্চয়। পাতাগুলো কেমন চিমসে মার্কা।
আসলে উইপোকার জন্যে এ-দশা। উইপোকাগুলোকে যদি মেরে দিতো গভর্মেণ্ট।
গভর্মেণ্ট পোকা মারে নাকি।
গভর্মেণ্ট মানে সরকারী লোক। এ বাগানের মালি কিংবা তার চেয়ে উঁচু কেউ—

রাধা জোর দিয়ে বললো, তারাও পারবে না। আমার বাবাকে দেখেছি—সাত হাত গর্ত করে উইপোকাদের ডেরায় রাণী পোকাটাকে ধরতে। মশালের আগুনে সারা ডেরা পুড়িয়ে তবে রাণী পোকা সাবাড়।

আর উই ধরেছে ?

নাঃ! ওই রাণী পোকাকে যদি সাবাড় করা যায়—তবে ওদের হাত থেকে বাঁচলে, নইলে নয়।

এদিনই দুপুরে বীরেন দত্তগুপ্তকে তিনটে ছারপোকা মিলে অতিষ্ঠ করে তুললো। আগেকার ক্যাবিনেট টেবিলের ফাঁকে একজোড়া মাতব্বর গোছের ছারপোকা বীরেনের কনুই হাত—সব কামড়ে ফুটো করে ফেলল। অতিষ্ঠ হয়ে বীরেন একটা আলপিন টেবিলের ফাঁকে ভরে দিয়ে ওদের খুঁজতে লাগলো। কিন্তু নাগাল পেল না। একসময় ইচ্ছে হোল—টেবিলটাতেই আগুন লাগিয়ে দেয়। যে-চেয়ারে বসেছিল—তার হাতলেও ওই একই অবস্থা। একটি অত্যন্ত ধুরন্ধর ছারপোকা বীরেনের ট্রাউজারের সেলাইয়ের খোলা জোড় দিয়ে এমন বেমক্কা জায়গায় কামড়াতে লাগলো—পেছনে হাত পাঠিয়ে চুলকেও কুল পেল না বীরেন। কোত্থেকে ? কোনদিক থেকে ? অফিসে এখন কাজও বেশি। পুরনো ঠিকেদারী প্রতিষ্ঠান। কোথাও এরা ব্রিজ ধরে। কোথাও কালভার্ট। জলের ট্যাংক। নয়তো লেডিজ পার্ক। অনেক কিছুই এরা বানাচ্ছে। বানিয়ে আসছে। এখন কলকাতার আণ্ডারগ্রাউণ্ড নিয়ে এরা মজে আছে। নন্দন রোডে বর্ষায় জল জমে। উঁচু করো। জলের লাইন তুবড়ে গেছে। ঠিক করো। করে দিচ্ছি স্যার। স্যুয়ারেজ লিক করছে। ঠিক করে ফেলেছি স্যার। এই ঠিক করা মানে ড্রাফটসম্যান—হিউম পাইপ—রাস্তা খোঁড়া—আবার বোজানো। নড়তে চড়তে পয়সা। একদিন সাইটে যেতে হয়েছিল বীরেনকে। কাস্টিং কোম্পানীর লোকজন বাহাত্তর ইঞ্চির জায়গায় ষাট ইঞ্চি পাইপ দিয়েই কাজ সেরে দিচ্ছিল। সেটা ধরা পড়ায় সব কাজের ওপর চেক রাখতে

হচ্ছে। ঠিকেদারীর একটু এদিক ওদিক হলেই বিল ক্যানসেল। মে মাসের রোদ চারদিক পুড়িয়ে দিচ্ছিল। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের পাশেই মেডিকেল কলেজ। মাঝের রাস্তাটায় ছায়া। সেটা খোঁড়া হয়েছে। লোহার পাইপ। এঁটেল মাটি। হলুদ-কালচে। এই দিয়ে কলকাতার বুকের ভেতরটা। বাইরে এমন করে ফুটপাথ, বাড়ি পিচ রাস্তা দিয়ে ঢাকা যে ওপর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

বীরেন ছায়া ঢাকা পিচ রাস্তায় দাঁড়িয়েও গরমের হলকা থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। তাই কলকাতার বুকে খানিকটা নামলো। ধাপ কেটে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। পাইপের পর পাইপ। ঠিকেদারীর মিস্ত্রিদের সঙ্গে আরও খানিকটা নিচে নেমে স্যুয়ারেজ লাইন দেখতে লাগলো। এ গাঁথনী কতদিনকার?

ধাঙড় এসে অনেক আগে থেকেই পাইপের মুখ আরেক পাইপে জুড়ে দেওয়ায় এদিকটায় কোন দুর্গন্ধ নেই। তবু কী একটা চাপা শুকনো গন্ধ—কলকাতার নিচের বাতাসে। সেদিনই প্রথম জানতে পারে বীরেন—আসলে কলকাতার নিচের পাতালটায় কোন থই থই ব্যাপার নেই। সবটাই জটিল পাইপের জটলা। এঁটেল মাটি মাখানো। পাইপগুলোর নিচে শিরতোলা পেনসিলের কায়দায় আগেকার নালী। দুখানা দুখানা ইঁটের জোড় ত্রিভুজ ধাঁচে চুনসুরকির মশলায় জোড়া। এজায়গাটা রাস্তা থেকে তিন মানুষ নিচে। বীরেনদের কোম্পানীর ওভারসীয়ারবাবু ছজন মিস্ত্রি নিয়ে মাপামাপি করছিল। বীরেন সাহস করে বললো, এটাই কি আদি নালা?

ওভারসিয়ার চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ স্যার। দেখুন—কতদিন ধরে টিকে আছে। তখন তো আর হিউমপাইপ বেরোয়নি। রাস্তার এত নিচে বসালো কি করে?

তখন তো কলকাতা এত উঁচু ছিল না। আস্তে আস্তে এই শ-দেড়েক বছরে উঁচু হয়েছে। দেখুন না গাঁথুনীর ধাপগুলো। এগিয়ে যান—

ভেঙে পড়বে না তো ?

না স্যার। মাথার ওপর দিয়ে লরি যাচ্ছে তো।

বীরেন বললো, কেঁপেও উঠছে তো।

তা কাঁপছে। কলকাতার ভিতের মাটি তো কিছু নরম। এগিয়ে যান। বীরেন বেশিদূর যেতে পারলো না। শালবল্লার ঠেকোর নিচে দাঁড়িয়ে দম নিয়েই বীরেন এগোলো। প্রথমে চোখের পাতা টেনে দেওয়া অন্ধকার। তারপরই একটু ফিকে হয়ে অন্ধকার কেটে গেল। চাপা ভ্যাপসা গন্ধ। এঁটেল মাটির শীত। কত পুরনো মাটি। আচমকা মাথার ওপর তাকাতেই বীরেন থমকে গেল।

কলকাতার মলাট—পিচ রাস্তা, ফুটপাথ।

তার উল্টোদিকেই—কলকাতার এই ঢাকনার গায়ে—যতদূর চোখ যায়—শুধু পোকা—শুধু পোকা। আর এগোতে ভরসা হোল না বীরেনের। এগুলো কি ?

ভয় পাবেন না। ওরাও আছে।

এত পোকা ?

আরও ভেতরে যান না। কত দেখবেন।

বীরেন আর এগোতে পারলো না। কয়েকশো কোটি পোকা। কলকাতার মলাটের এ-পিঠে বুক লাগিয়ে থমথমে অবস্থায় ঝুলে আছে। সারা কলকাতার নিচে এই অবস্থা ?

হাঃ হাঃ করে হাসলো ওভারসিয়ার। এতে যে হাসির কি আছে বুঝতে পারলো না বীরেন। তার শীত করছিল। কতকালের চাপা মাটি। বাইরের বাতাস পায় না।

এক এক জায়গায় এক এক রকমের পোকা। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের নিচের পোকাগুলো সাইজে সবচেয়ে বড়। এরকম পোকা পৃথিবীর কোথাও নাকি নেই। কিছু দেখা গেছে সানফ্রান্সিসকোর পাতালে।

আপনি জানলেন কি করে ?

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহেবরা এসেছিল। তারা বলাবলি করছিল। আপনি শ্যামবাজারের পাতালে পোকাগুলো দেখেননি তো ?

কি করে দেখবো। এই তো প্রথম কলকাতার নিচে এলাম।

তাই বলুন। ওখানকার পোকাগুলো শুঁড়ওয়ালা। কামড়ালে রক্ষে নেই। একটা আরেকটার পিঠে চড়ে বসে থাকে।

কি করে কাজ করেন আপনারা?

আগে পেট্রল স্প্রে করে জায়গাটায় আগুন লাগাই।

আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কলকাতার নিচে তো রবার বা কাঠ নেই। আগুনে পুড়ে পোকাগুলো একদম আলকাতরা হয়ে যায়। লেই লেই। বিকট গন্ধ।

কি করেন?

এঁটেল মাটি চাপা দিয়ে রাখি। কাজ করতে হবে তো। সারা কলকাতা জুড়েই তো পোকা। কতকাল আছে ওরা—

মরে না?

অমর তো নয়? তবে ওদের বংশতালিকা কে রাখবে বলুন? আর কখন মারা যায় জানাও তো যায় না। টুপটাপ খসে পড়ে। আমরা তো শুধু আরসোলা দেখতে পাই ওপরে।

আরসোলাই শুধু কলকাতায় যায়। এরা যায় না।

এরা গেলে তো কেলেঙ্কারি হয়ে যেতো।

ওকথা বললেন কেন স্যার?

দেখুন শুধু আরসোলার জন্যেই স্প্রে বেরিয়েছে। সেদিন পড়ছিলাম —কতশো কোটি ডলার খরচা করে আরসোলা কাবু করার ওষুধ বের করেছে সায়ন্টিস্টরা। এত জাতের এত পোকা সব যদি কলকাতা রওনা হয় তো আমরা ফতুর হয়ে যাবো ওভারসিয়ারবাবু। সব টাকা পয়সা পোকায় চলে যাবে। আমরা খাবো কি তখন?

ওভারসিয়ার আবার সেই খ্যা খ্যা হাসি হাসলো। নিজেই থামলো। কলকাতার নিচে এ জায়গাটা অন্ধকার। মাথার ওপর এক দিকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। আরেকদিকে মেডিকেল কলেজ।

ওভারসিয়ার বললো, তখন আমরা পোকা খাবো। পোকার ডালনা। পোকার ঝোল।

মানুষ তো মরে যাবে ওভারসিয়ারবাবু।

মরবে কেন? এ-ত প্রোটিন।

এ-ত বিষ ওভারসিয়ারবাবু?

মানুষ ইমিউন হয়ে যাবে। বলেই কলকাতার ঝাপসা পাতালে ওভারসিয়ার আবার হাসলো। সেই খ্যা খ্যা।

লোকটা কি পাতালেই থাকে।

আপনি ভাবছেন কেন স্যার।

এত পোকা যদি কলকাতায় যায় তো কোন স্প্রে লাগবে না।

কেন, কেন?

কলকাতাই চাপা পড়ে যাবে।

কি বললেন?

হ্যাঁ স্যার। এদের যা অক্সিজেন দরকার।—এরা যদি বাতাস থেকে টেনে নেয় তো—আপনার আমার অক্সিজেনে টান পড়বে। আমরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। ওরা তখন আমাদের শরীরের ওপর গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে।

বীরেনের শরীরটা ভেতর থেকে কেঁপে গেল। সারা কলকাতা তার জিনিসপত্তর নিয়ে খোলা পড়ে থাকবে। গেরস্থ বাড়ীর ভেতর মা বাবা ভাই-বোন—সবাই এলোমেলো পড়ে আছে। তাদের গা-গতর সব শুঁড়ওয়ালা পোকায় ঢেকে গেছে। শেয়ালদায় লোকাল ট্রেনগুলো পোকায় থিক-থিক করছে। অফিস কাছারির খাতাপত্র খোলা। একটা খৈতান পাখা শুধু খোলা ছিল। তার নিচের টেবিলটায় শুধু পোকাগুলো বসতে পারেনি। দিল্লির হটলাইনে টেলিফোন বাজছে। চিফ মিনিস্টারের ঘরে। রিসিভার তোলার কোন লোক নেই।

বীরেন এক লাফে উপরে উঠে এসে হাঁপাতে লাগলো।

নিচের থেকে ওভারসিয়ার বললো, চললেন স্যার—

অফিসে না ফিরে বাড়ী ফিরলো বীরেন দত্তগুপ্ত। এই বীরেনের জীবনটি মোটামুটি গোছালো। সে ইটালিয়ান নেটের মশারিতে শোয়। পানপরাগ দিয়ে পান খায়—দোবেলা খাওয়া দাওয়ার পর। ছেলেকে চিঠির গোড়ার অ্যাড্রেস করে—মাই ডিয়ার সন। নিয়মিত দাড়ি কামায় ও নখ কাটে। ছোট ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাধারণত মাসের গোড়াতেই দিয়ে দেয়।

অসময়ে বাড়ি ফিরে আসায় রাধা অবাক হোল। ছুটি হয়ে গেল?

নাঃ। চলে এলাম। আজ খুব ফুলকপির তরকারী খেতে ইচ্ছে করছে রাধা।

এখন কোথায় ফুলকপি পাবে। সে উঠতে উঠতে এখনো চার পাঁচ মাস। রাঁচির কপি নাকি আগে আগে ওঠে। চল না নিউমার্কেটে গিয়ে দেখি।

এত ইচ্ছে হচ্ছে। চল যাই। সাধন ঘুমোচ্ছে—

স্কুলে যায়নি?

বুকে একটা চোট পেয়েছে খেলতে গিয়ে। তাই স্কুলে যেতে দিইনি। রেস্টে থাকুক তিনদিন। ব্যথাটা কমে যাবে।

সিরিয়াস কিছু।

বলা তো যায় না। সাবধান হচ্ছি তাই।

বীরেন একবার উঁকি দিয়ে দেখলো। স্কুলে না গিয়ে তের চোদ্দ বছরের একটা শরীর শুয়ে আছে। কপালের নীল শিরা জেগে উঠেছে। এই শরীরও অক্সিজেন টান পড়লে আচমকাই স্কুলের মাঠে এলোমেলো পড়ে থাকতে পারে। তখন পোকারা হেঁটে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে ওর গায়ের ওপর।

বীরেন দত্তগুপ্ত সাধনের গায়ের ওপর দিয়ে আস্তে হাত বোলাতে গেল। জেগে গিয়ে সাধন পটাং করে উঠে বসলো।

করছ কি বাবা? ঘুমোতে দেবে না?

ঘুমো। ঘুমো। শুয়ে পড়।

শুয়েই তো ছিলাম।

কোন জায়গাটায় ব্যথা তোর ?

ওপর থেকে বোঝা যায় না। হঠাৎ খচ করে ওঠে

কোন গর্তেটর্তে নেমেছিলি ?

তা নামতে যাবো কেন ? তুমি তো আচ্ছা লোক বাবা।

বীরেন তার এই বংশধরের মুখে সোজাসুজি তাকাতে পারলো না। উঠে গেল।

মার্কেটে এখনো অসময়ের কপি আসেনি। এলেও পাওয়া যাবে না। চীনে হোটেলগুলোর দাদন দেওয়া আছে। এক দোকানী বললো ধাপার মাঠের বাজারে এক ব্যাপারী অসময়ের কপি আনে। নিজ চাষের। লোকটির নাম জয়হিন্দ দলুই। ওর ভায়রা ভাই স্বাধীন মজুমদার। ওরা দু'জনায় অসময়ের কপি নিয়ে বসে। নিজ চাষের।

ধাপা চেনো ?

বীরেন বললো, কোনদিন যাইনি। যাবে ?

এই গরমে ?

বিকেলে ভালো লাগবে। রোদ তো পড়ে আসছে।

সত্যিই তাই। পড়তি রোদ। ঘেষ ফেলা রাস্তায় লম্বা লম্বা ছায়া। প্রথমেই একটা রেল লাইন। তারই গায়ে মাঠের বাজার। দেওয়াল ঘেরা এই বাজারের গেটে লাহাদের দারোয়ান তোলা আদায় করছিল বসে বসে।

কি গন্ধরে বাবা এখানে।

নাকে কাপড় দিও না রাধা। তাহলে পাবলিক তাকাবে।

রেখে দাও তোমার পাবলিক। বোটকা গন্ধ। এত নোলা কেন তোমার ? টং টং করে আমরা ধাপার বাজারে কপির খোঁজে এসেছি শুনলে—লোকে কি বলবে ?

তুমি গোড়ায় না বললে তো রাধা আমি আসতাম না।

আমি ভেবেছিলাম—মার্কেটে পেয়ে যাবো। মাঠের বাজারেও কপি পাওয়া গেল না। একজন ব্যাপারী বললো, রেল লাইন ধরে

সিধে চলে যান। বাঁ হাতে ধধুলের ক্ষেত পড়বে। মাইলটাক রাস্তা। তারপর জয়হিন্দ দলুইয়ের ক্ষেত। ওখানে যেন এক টেরে কয়েক লাইন ফুলকপি দেখেছিলাম—

পড়তি বিকেলে ঠাণ্ডা বাতাস ছিল। ছিল ছায়া। ওরা দু'জনে রেল লাইন ধরে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। সামনে ভরা বর্ষায় জমা জল। অথচ এখনো তো বর্ষা আসেনি। সেই জলে ঢেউ। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে হোগলার দল। দুলছে তো দুলছেই। তাদের ভেতর দিয়ে উঁচু ডাঙায় বসানো রেল লাইন ধরে ইঞ্জিন যাচ্ছে। খান ছ' সাত ওয়াগন। বাতাসের থাবড়ায় ইঞ্জিনের ধোঁয়া চেপটে গিয়ে উল্টো দিকে শিখা হয়ে আছে।

এক ব্যাপারী ডালা বোঝাই লাউ নিয়ে ফিরছিল।

এ কোথাকার ট্রেন ভাই ?

এ তো ধাপা লাইন।

কোথায় যাচ্ছে গাড়ি ?

দূরে দূরে ময়লা ফেলে আবার ফিরে আসে। আগে ছ্যাখোনি ?

ময়লা ফেলতে ট্রেন লাইন ?

তুমি কোথাকার লোক বাপু ? এ তো একশো বছরের লাইন। যেখানে দাঁড়িয়ে আছো—এ তো ময়লা ভরাটি জায়গা।

এত ময়লা ? কোথাকার ?

কলকেত্তার। সব তো ডোবা ছিল। ময়লায় ভরে ভরে ডাঙা এখন।

এত জল ?

এ জল গত সনের বর্ষার। এই জলের তো শেষ নেই। ময়লায় ভরে গিয়ে জল পিছিয়ে যাচ্ছে।

শুধু জল।

হ্যাঁ গো বাবু। এও মুতের জল নয়। সে তো ওই দুই ট্যাংকিতে সাফ হয়।

লোকটা চলে যেতে ডান দিকে তাকিয়ে ট্যাংক পেল বীরেন। অ্যালুমিনিয়ম রঙয়ের। লোহার সিঁড়ি। দেখলে মনে হবে—কোন ইলেকট্রিক তৈরির কারখানা।

রাধা থেমে পড়লো। আর যাবে?

এসেছি যখন দেখে যাই। একথা বলতে বলতে বীরেন ভাবছিল—তাহলে কলকাতার জন্যে কতদিন ধরে পাঁয়তারা কষা হচছে? ময়লার জন্যে রেল লাইন। পাতালে পাইপ আর নালীর জট। তারপর কারখানা সাইজের দুই ট্যাংক। এ লাইন ধরে একশো বছর ময়লা ফেলা চলছে। একদিন তো এ শহরের ময়লা ফেলতে ফেলতে রেল লাইন শেষে সুন্দরবন পৌঁছে যাবে। ডোবা, খানাখন্দ—সব ডাঙা হয়ে যাবে শেষে। আমাদের কত ময়লা? জীবনটা একটু সুখের করতে—একটু স্বস্তির করতে এত এত আয়োজন—ব্যবস্থা? কি না কেন—আমরা একটু পরিষ্কার থাকবো। গন্ধ পাবো না নাকে। মাছি বসবে না ধারে ভিতে। তার জন্যে মাইলের পর মাইল—হোগলার দেশে—জলের দেশে।

কোথায় তোমার জয়হিন্দ দলুই? আর কতদূর?

এদের তো মাইলের জ্ঞান গম্যি জানোই!

আর হাঁটতে পারছি না ওগো।

তবে এসো—এই রেলিং দেওয়া জায়গাটায় বসি।

রাধা বানান করে করে পড়লো। সেডিমেনটেশন ট্যাংক।

ছায়া পড়েছে। এদিকটায় ইলেকট্রিক আছে। কপিকল ধরণের লোহার চেন লোহার চাকায় পাকানো। ট্যাংকটা ঘিরে জলের গোল চৌবাচ্চা। সিমেন্টকরা মোটা ভিতের বাইরে লোহার নালি পথ—বিরাট এক ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়েছে। সে মাঠে ঘাস একদম ভেলভেট।

লোকজন সে মাটি কোদালে কুপিয়ে ছোট ছোট ডিঙি ভর্তি করছে।

রাধা গিয়ে বললো, কোথায় নিচ্ছো এ সব?

মাথায় গামছাবাঁধা একজন মাতব্বর গোছের লোক বললো, ভেড়িতে যাবে। আপনারা এখানে কি করতিছেন?

ধাপার ফুলকপি কিনবো ভেবেছিলাম।

এবার তো ফুলকপি হয়নি মা।

কে যেন জয়হিন্দ দলুই—

আমিই জয়হিন্দ। গত সনের বানে কুশি চারা সব নষ্ট হল।

এ মাটি কি করবে?

বড় সারি মাটি মা। ওই ট্যাঙ্কির যে ছাঁকা জল এসে এই খালে পড়ে। ভেড়িতে নিয়ে যাই আমরা মাছ চাষে।

এই সময় বীরেন এসে রাধার পাশে দাঁড়ালো।

চোয়ানো জল এ মাঠটায় পড়ে পড়ে সার হয়ে থাকে কোদালে তুলে আমরা ভেড়িতে দি। আবার চাষের ক্ষেতেও লাগাই।

গর্ত হয়ে যাবে যে জায়গাটা।

হয় না বাবু। জলের ভিতর পাঁক ময়লা থাকে। জমে জমে আবার গর্ত ভরে যায়। কেমন ঘাস দেখুন। একদম রং করা মনে হবে।

সত্যিই তাই। গভীর, ঘন সবুজ। নজগজ করছে। মাটিটা নরম। কোদালে তুলতে বিশেষ পরিশ্রম নেই।

বীরেন বললো, এ তো কলকাতার নালী দিয়ে আসা জল—তাই না?

হ্যাঁ বাবু। সবটাই গু-মুত। অন্য জলও আছে—

রাধার ঘেন্না করছিল। কিন্তু আশ্চর্য। বাতাসে কোন গন্ধ নেই।

বীরেন ভয়ে ভয়ে বললো, মাছ এই জল খেয়ে মরে না? পোকা থাকে তো—

থাকে। সেটাই তো মাছের খাবার বাবু। তাড়াতাড়ি বাড়ে। ওই পোকা খেয়ে—জল খেয়ে—

রাধা ওক্ টেনে বমি করে ফেললো। হড় হড় করে। লজ্জা, ভয় একসঙ্গে তাকে কাবু করে ফেললো। আমি দাঁড়াতে পারছি না ওগো। বলেই বীরেনের হাত দু'খানা ধরলো।

ভয় নেই কোন। মাকে ওই মাঠে বসিয়ে দিন। আমি ডাব পেড়ে আনছি। সুস্থ হয়ে যাবেন এখুনি।

বীরেন ঘাবড়ায়নি। কিন্তু কোন মহিলা অজানা জায়গায় এভাবে অজানা লোকের সামনে যে বমি করে ফেলতে পারে—তা ভাবতেও পারেনি সে। মাছগুলো তাহলে কলকাতার পাতালের পোকা সাবাড়

করে খাচ্ছে—এটা একটা আশার কথা। বোসো। ওগো, এখানটায় বোসো।
বাড়তি সুর্যের লালচে আলো তখন রাধার মুখে। কোন শাপখোপ নেই তো—
তা আছে মা। বড় বড় বিষধর। ডোবা ভরাটি জায়গা তো।
বাবাগো—বলে রাধা উঠতে যাচ্ছিল।
শুধু শুধু ভয় পাবেন না মা। কোদাল-এর এক কোপে দু-টুকরো করে দেব না। আসুক না গোখরো।
পর পর দুটো ডাব খেয়ে রাধা বড় একটা ঢেকুর তুললো। তখন তার সাদা বমি—সবুজ ঘাসে এক পোচড় রং হয়ে পড়ে ছিল। অবেলায় খেয়েছি তো। তারপর এই গনগনে গরমে বেয়াড়া জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। আর কি জায়গা ছিল না ওগো?
আমি তো আগে কোনদিন ধাপায় আসিনি।
আচমকাই অন্ধকার নেমে এলো। সেডিমেনটেশন ট্যাঙ্কের রেলিং পোস্টে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলো। সারা তল্লাটে এখন জলজ ঠাণ্ডা হাওয়া।

দুই

সেদিন রাত একটা বারো মিনিটে বীরেন দত্তগুপ্ত স্বপ্ন দেখলো—কলকাতার পাতাল-এর পাইপ লিক হয়ে গেছে। নানা জায়গায়। পাতাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে তরলে। সেই তরলের স্রোতে নানা চেহারার পোকা ভাসতে ভাসতে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনু পার হচ্ছে। চার পাশের মাটি নজবজে হয়ে যাচ্ছে। এয়ার লাইনসের অফিস হেয়ার স্ট্রীট থানার গায়ে খানিকটা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে পুলিশকে দেওয়াল চাপা লোকের মতই কাৎ হয়ে বেরোতে হচ্ছে। আর এয়ার লাইনসের পাইলটরা বাঁশের মই বেয়ে নিচে নামছে। কারণ, ওদের সিঁড়িটা একতলা থেকেই ধাপগুলো শূন্যে তুলে বাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে কাৎ হয়েছে।

রাস্তায় যে কজন লোক ছিল—তারা বীরেনের মতই চিন্তিত। কলকাতার বাতাসে এমন দুর্গন্ধ কোনদিন পাওয়া যায়নি। নিচের পাতালের কোন নালী—কোন পাইপ —কোথায় কোথায় ফুটো হয়েছে—তা এখন খুঁজে বের করাই কঠিন। মেইনলি তিন টাইপের পোকা বেরিয়ে পড়েছে। শুঁড়ওয়ালা পোকাগুলো তরল দুর্গন্ধের ওপর ভাসতে ভাসতে উথলে উঠে ফুটপাথে গিয়ে পড়ছে। ওদের লক্ষ্যই হোল—জংধরানো কেননা, গুটি দশ-বারো পোকা চোখের সামনে ফুটপাথে উঠেই ইসলামিয়া হাসপাতালের সামনে ঘোড়ার জল খাওয়ার বহু আগের লোহার চৌবাচ্চায় গিয়ে চড়াও হোল। খানিক বাদে ওরা যখন চৌবাচ্চা ছেড়ে পাশেই লাইটপোস্টটা বেছে নিচ্ছিল —তখনই বীরেন দেখতে পেল—লোহার চৌবাচ্চার জায়গায় জায়গায় আনকোরা জং ধরেছে। তিনটে জংধরা জায়গা বীরেনের চোখের সামনে আসল ফুটোয় গিয়ে দাঁড়ালো—আর সেই তিন সদ্য ফুটো দিয়ে কয়েকদিন আগের বর্ষায় জমা জল চুইয়ে চুইয়ে ফুটপাথে পড়তে লাগলো।

এমন সময় জয়হিন্দ দলুই লুচিভাজার বড় জালি হাতা দিয়ে এক থাবা ওই শুঁড়ো পোকা ছেকে তুলে নিল। তার সঙ্গে ঢ্যাঙ্গা মত খালি গায়ে একজন লোক। পায়ে রবারের ফিতে বাঁধা জুতো তার। জয়হিন্দ ছেকে-তোলা পোকাগুলো কোমরের পলিথিন ব্যাগে ভরেই আবার আরো এক জায়গায় লম্বা হাতখানা ভরে দিল।

জয়হিন্দ না ?

আজ্ঞে চিনতে পেরেছেন দেখছি।

এদিকে ?

আজ্ঞে বেরিয়ে পড়লাম। মা ভালো আছেন ?

ও কথায় কান না দিয়ে বীরেন পাশের লোকটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতেই জয়হিন্দ বলল, আজ্ঞে আমার বায়রা বাই। ও ফুলকপির চাষ করতো। ভালো নাম স্বাধীন মজুন্দার।

হ্যাঁ। ওর নামও তো শুনেছি। চললে কোথায় তোমরা ?

আর বলেন কেন! মা তো সেই ভাব খালেন সন্ধ্যেবেলা। আপনারা চলে এলেন। সে রাত থেকেই যত পোকা ছিল—সব কলকাতা পাড়ি দিল। আমরা ভাবি—যায় কোথায়। মাছগুলো শুকোতে লাগলো। টাংকিতে রোজ পোকা দরকার অনেক। তা না হলি ময়লা ঝাঝরা করে খাবে কারা? কারাই বা জিনিষটারে মাছের খাবার করে দেবে? মাছ শুকোতে লাগলো।

তখন আমার বায়রা বাই স্বাধীনকে বললাম—ও মজুন্দার—চলো যাই কলকেতা যাই। শুঁড়ওয়ালা পোকাদের দেশে—

কথা বলতে বলতেই তুবার ছাকা-হাতায় দু প্রস্থ শুঁড়ওয়ালা পোকা তুলে নিয়ে জয়হিন্দ দলুই তার কোমরের পলিথিন ব্যাগে ওগুলোকে রাখলো।

কি করবে ওগুলোকে নিয়ে?

দেখি কি করা যায়? ভাবছি ভেজে খাবো।

ওমা! সে কি?

আপনারা সব কথায় চোখ কপালে তোলেন কেন বলুন তো? খানিকটা মাংস তো পোকাগুলোর গায়ে পাবো। একি ফেলে দেওয়ার জিনিষ? এতকাল যে খাইনি—সে তো আমাদেরই বোকামো। বয়রা বাইয়ের সঙ্গে গোটা কয়েক ভেজে খেলাম।

তাই নাকি? কেমন খেতে?

কাঁঠালের বিচি ভেজে খেয়েছেন? অনেকটা সেরকম। খানিকটা নুন মিশিয়ে খেলে তো চমৎকার।

আর কি খাবার জিনিস নেই জয়হিন্দ?

ও স্বাধীন দাদা? বাবুকে কিছু বলো না—

স্বাধীনের গলা দিয়ে লোহার করাত-কাটার আওয়াজ বেরিয়ে এলো। ছোটবেলায় কুশী আম, কাঁচা ঢেড়স, আধপাকা গাব খাননি বাবু? এ সুঁড়ো পোকাও ভেজে খেলে তেমনি—কচ কচ করে মুখে দিলি। আবার মাংসু মাংসু ভাব। আবার ভদ্দর-লোকেরা যে কাজু বাদাম খায়—তাও বলতি পারেন।

জয়হিন্দ আরেক হাতা পোকা তুলে নিয়ে কোচড়ে রাখলো।—পুড়িয়ে খেলি আরও ভাল লাগে।

বাতাসে সে দুর্গন্ধ এখন অনেক কম। লোকজন কাপড়-জামা বাঁচিয়ে বাসে উঠছে। বাস থেকে নামছে। বীরেন বললো, ঘেন্না পাওনা? আমার বায়রা বাইকে বলুন নে কেন। কি স্বাধীন? ঘেন্না পাও? মোটেই না। পোকাগুলো মিলে মানুষ-এর ময়লা ঝাঝরা করে। তাই জল বেরোয় টাংকিতে। সে জল খেয়ে মাছ নাদুর নুদুর হয়। সে মাছ খেয়ে ভদ্দরলোকরা ভুড়ি ভাসায়? বাবুদের মেয়েছেলের শশার চাকলার মত পাতলা পেট বেরিয়ে থাকে—শাড়ির বাইরে। তাই না বাবু?

বীরেন চুপ করে থাকলো।

তখনো মজুন্দার বলে যাচ্ছিল, গোরস্তানে মানুষের শরীর তো পোকায় খেয়ে খেয়ে মাটিতে মিশায়। তাই না বাবু? সেই মাটিতে মানুষের শরীরের রস মিশে যায়। আমি—আমার বায়রা বাই জয়হিন্দ সেই মাটিতে ফুলকপি বসাই—আপনারা ডালনা করে খান। আর কটা পোকা খেলিই ঘেন্না। হাসালেন বাবু—

পৃথিবীর এত বড় একটা বিপদ। কলকাতার এখন এমন বিপর্যয়। শুঁড়ো পোকাগুলো ক্ষেপে গিয়ে সব পাইপে জং ধরিয়ে লিক করে বসে আছে। আর দুই ভায়রা ভাই মিলে ভাজা খাবে—পুড়িয়ে খাবে বলে দিব্যি পোকা ধরতে বেরিয়ে পড়েছে? এইভাবেই মানুষ মানুষের জন্যে প্রলয় ডেকে আনে। মানুষের কি হবে? আমরা কি শেষ পর্যন্ত এই জংধরানো পোকাদের ডেকে আনা দুর্গন্ধ তরল প্লাবনে শেষ হয়ে যাবো। না এর একটা বিহিত হবে।

ম্যানহোল থেকে ময়লা সাফাইয়ের একজন মানুষ ছিটকে বেরিয়ে এলো। যন্ত্রণায় লোকটা চেঁচাচ্ছে। তখনো তার গায়ে চার-পাঁচটা শুঁড়ওয়ালা পোকা। বেশ বড় বড়। লোকটা ছুটে এলো বীরেনের কাছে। বাবু বাঁচান। উঃ! কি রাক্ষুসে পোকা।

ভায়রা ভাই দুটি ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

ধীরেন পকেট থেকে রুমাল বের করে লোকটার বুকের ওপরে বসে থাকা বড় পোকাটাকে খাবলে ধরলো। টানতেই পোকাটা খুলে এলো—কিন্তু লোকটার বুকে পাতলা করে চামড়া খুলে গেল। আর অমনি বিকট চীৎকারে লোকটার গলা বউবাজারের ক্রসিং অব্দি ছড়িয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে বীরেন দত্তগুপ্তর ঘুম ভেঙ্গে গেল।
সেন্ট্রাল অ্যাভিনুতে এ কি ধারার আলো? ফিকে মত। ভোর হয় হয়। বীরেন ভালো করে তাকিয়ে দেখলো সে আর রাধা পাশাপাশি শুয়ে। রাধা তার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে। গরমকালের ভোর—তাই আলো বেরিয়ে পড়েছে ভীষণ সকাল সকাল।
এইরকম ভোরবেলায় ছেলেবেলা মেশানো থাকে। ঘটি হাতে দুধ আনতে যাওয়া। বকুল ফুল কুড়িয়ে বুনো লতায় মালা গাঁথা। সামার-ভেকেশনের দিন টগরের তোড়া হাতে মর্নিংস্কুলে। আর এরকম ভোরে আমি কি ভয়ঙ্কর প্লাবন দেখে যাচ্ছিলাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। উঃ।
বাঃ এই সময় কি কেউ অগোছালো হয়ে ঘুমোয়। ভোর রাতেই ওর ঘুম গাঢ় হয়। বহুকাল আগে শেষবার মা হয়েছে রাধা—তাও তো প্রায় চোদ্দ বছর—সাধনের যা বয়েস। তাই যে-বয়সে মেয়েরা মহিলায় প্রমোশন পেতে পেতে মাসীমা হয়ে যায়-সেই বয়সেও রাধা অগোছালো হয়ে ঘুমিয়ে নিজেরই অজান্তে বীরেনকে ভীষণ অ্যাকটিভ করে দিল।
ও-পাশ ফেরা অবস্থাতেই রাধা বললো, উহু। ঘুমোতে দাও।
এতটা সেলফিস কেন তুমি বলতো। সারা রাত তো ভোস ভোস করে ঘুমিয়েছো।
রাধার দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে বীরেন বলতে থাকলো, কী বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখলাম রাধা। ঘেমে নেয়ে যাবার অবস্থা। কলকাতার স্যুয়ারেজ লিক হয়ে গেছে। জয়হিন্দ দলুই পোকা পুড়িয়ে খাবে—
ভোরবেলা চুপ করে ঘুমোও তো। আমাকেও ঘুমোতে দাও।
বীরেন চুপ করে গেল। মনে মনে বললো ফ্রেস—সুন্দর থাকার জন্যে? সেলফিস। আসলে ভীষণ মিন মাইণ্ডেড তুমি রাধা। অন্যের প্রয়োজন তুমি একদম বুঝতে চাও না।

কিন্তু মুখে বীরেন বললো, এমন বিচ্ছিরি স্বপ্ন। শুঁড়ওয়ালা পোকাগুলো লোহার পাইপের ওপর বসে তাদের লালায় জংধরিয়ে ফুটো করে দিচ্ছে। আর অমনি দুর্গন্ধ লিকুইডে সব ভেসে যাবার জোগাড়।

চুপ করো। দোহাই তোমার। ফুল কপির খোঁজে ধাপা, বানতলায় গিয়ে কি বমিটাই পেল—

এমন বিচ্ছিরি স্বপ্ন—

চুপ করো। তুমি তো দুপুরবেলাতেও ঘুমোলে স্বপ্ন দেখে ফেল! আধ ঘণ্টার ঘুমের ভেতরেও!

ঘুমের ভেতর রাধা—দুপুর, সকাল, রাত—সবই সমান। কাছে এসো।

বিরক্ত কোরো না।

এ কথায় বীরেনের—বিয়ের এই বিশ বাইশ বছর পরেও খুব ইনসাল্টেড্ লাগলো। এ কি? রাধা তুমি কি গোলাবাড়ি থানার ও সি? কোন কনেস্টবল্‌কে বলছো—ঘুমিয়ে আছি। এখন বিরক্ত কোরো না? আমি তো কোন ঘুষখোর সেপাই নই। কিংবা কোন ক্রিমিনাল হিসেবে থানায় আসিনি। আজই দুপুরে কলকাতার আণ্ডার-গ্রাউণ্ড কাজের ঠিকেদারী নিয়ে সি এম ডি এ-তে যে মিটিং হবে—তাতে আমি আমার কোম্পানীর হয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো। আমার ইনকাম ট্যাকস্ ক্লিয়ার। শুধু মডার্ন টেলার্স আট টাকা পাবে। আমার সঙ্গে তোমার স্বাভাবিক বিবাহিত স্বামীর সম্পর্ক। তাও তো স্বামী কথাটার ব্যুৎপত্তিগত মানে কোনদিন অ্যাপ্লাই করিনি তোমার ওপর।

কাছে এসো।

দ্যাখো। কাল থেকে আমার বুকে ব্যথা। আমি অতক্ষণ পারি না। মোটা হয়ে গ্যাছো তুমি আগের চেয়ে। ভোরে ঘুম ভেঙেছে। যাও না—মর্ণিং ওয়াক করে এসো।

বীরেনের এ কথাটা ভালো লাগলো। তাহলে আমার শরীরের ভার অন্তত তোমার বুকে একটা স্থায়ী ব্যথা ডিপোজিট করতে পেরেছে।

এটাই বা কম কি। প্রথমে বডি। তারপর তো মাইণ্ড। তোমার মনে আমি সাইকোলজিকালি শেষ পর্যন্ত এমন একটা বড় চেয়ার পাবো যাকে তুমি দূর থেকে তোমার মনের সিংহাসন বলে ভাববে।

এসব কথা বলা যায় না। তাই বীরেন বললো, মর্ণিং ওয়াক করলেই আবার খিদে পাবে। শেষে হয়তো বাঁধা কপির ডালনা খাবার ইচ্ছে হতে পারে।

কিংবা কোন গাছের গোড়ায় উইয়ের বাসা দেখে তিন ঘণ্টা বোবা হয়ে থাকলে।

না রাধা। পোকা বাদ দিয়ে বাচার রাস্তা নেই কোন।

তাও তো ঘুনপোকা চোখে দেখা যায়না। ভাগ্যিস—

কাছে এসো।

জোর কোরো না লক্ষ্মীটি।

বীরেন বুঝলো, সে এখন আর চিরপরিচিত বীরেন দত্তগুপ্ত নেই। লণ্ড্রি-ওয়ালা সাধন ওভারসিয়াববাবু যে বীরেনকে চেনে—আর এখনকার এই বীরেন একদম অন্যরকম লোক। একটা কোন ছুটন্ত ট্রেন তার এখন না ধরলেই নয়। এমনি পড়িমরি অবস্থা। এর ওপর আবার শেতল-পাটিতে হাঁটু স্লিপ করছিল।

একটা জিনিস ভীষণ যন্ত্রণা দেয় বীরেনকে—ভেতরে ভেতরে।

মানুষের নাকি বউকে শুধু ভালবাসলেই চলে না। সেই ভালবাসা চাঙ্গা রাখতে—সঙ্গী শরীরটাকেও সময়মত জাগিয়ে নিতে হয়—ভালো-ভাবে—তার খাদ্য খাবার ঠিকমত জোগান দিয়ে যেতে হয়। নইলে—শরীর যদি সঙ্গী না হয়—তবে সব ভালবাসা খক হয়ে যাবেই।

এই জায়গাটা কিছুতেই মেলাতে না পেরে বীরেন একা একা ভোগে। কষ্ট পায়। একিরকম রাজমিস্ত্রির ব্যাপার স্যাপার—বিশেষ করে ভালবাসার সঙ্গে ? এত মোটা দাগের জিনিস বীরেন কিছুতেই মেলাতে পারে না—ভালবাসার সঙ্গে।

একদিন এক বন্ধু বলেছিল—বীরেন, তুই কি ভাবিস বলতো।

ভালবাসা মানে কি বেদানার ফুল ? ভালবাসা মানে কলাই থালা, স্টেনলেসের ডালের বাটি। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বীরেন মানতে পারেনি। সে চুপ করে থেকেছে। এখন সে রাধার মানা মানতে পারলো না।

কিছুতেই কথা শোনো না তুমি। বড় অবুঝ।

এখন বীরেনের কোন কিছু কানে যাচছে না। সে মনে মনে সব কঠিন অংকগুলো খুঁজতে লাগলো। ক্লাশ ফাইভে যে অংকটা অ্যান্নুয়েলে সে মেলাতে পারেনি। সেই যে সেই সিঁড়ি-ভাঙ্গাটা। বি এস সি-তে থিটা পাই গামা দিয়ে কয়েকটা বিচছিরি অংক ছিল। সেগুলোও সে হাতড়াতে লাগলো। যে সব অংক একদম মেলেনা—সেগুলো তার এখনই চাই। যে অংকে একটা স্টেপ মিস করলে কিছুতেই বাকিটা মেলে না—এমন অংক সে জীবনের পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ বছরেরও বেশি পেছন থেকে কুড়িয়ে আনতে লাগলো।

এখন আমি কিছুতেই রাধার মুখে তাকাবো না। তাকালে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। আমি বেড্ সুইচের নীলচে বোতামটা খুঁজছি—আর মনে মনে ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসের সেই অংকটা হাতড়াচছি। যেটা কোনদিনই মেলেনি আমার হাতে। সেটা বার বার কষে যাচ্ছি। আসলে রাধা এত সুন্দর।

খুক্ খুক্ করে হেসে উঠলো রাধা। কি হোল! এত তোড়জোড় করে শেষে এই—

তোমার ?

আমার কথা বাদ দাও। আমার কথা কি তুমি একটুও ভাবো ? আমি এখন কী করবো।

বাংলা উপন্যাসে থাকতো—সে এখন অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল। বীরেনের অবস্থাও তাই। আজও এই একই হাল আমার। আমি জীবনে একবারই রাধাকে সাহায্য করতে পেরেছি। যাকে বলে হেলপ্। বানতলায় কলকাতার পাতালের তরল যে-ট্যাংকে থেকে থেকে জল হয়ে বেরিয়ে আসে—তার সামনে রেলিং দেওয়া গাঁথুনি

দেওয়ালে দাঁড়িয়ে রাধা বলে ফেলেছিল, আমি পারছি না। আমায় ধরো। —তারপরেই সবুজ ঘাসে এক পোচড়া শাদা।

ঠিক তখনটায় রাধা একদম নিরুপায়। এরকম অবস্থাগুলো আমি খুব এনজয় করি। ও সাহায্য চাওয়ার অবস্থায় এলে আমার ভালবাসা একটা রাস্তা পায়। সত্যি সত্যি কি আমি ওকে ভালবাসি? না শারীরিক দখলটাই এখানে বড় কথা? সেই দখলের সুখটা পাছে ধরা পড়ে—তাই তার কাব্যিক নাম রেখেছি ভালবাসা। এইযে নিরুপায় অবস্থায় আমার ভালবাসাটা যে ভাল খেলে—তার কারণ, ওতো তখন সযুত থাকে না। ঢিলে-ঢালা হয়ে পড়ে। খুক খুক করে হেসে বলতে পারে না—কী। ব্যাস?

কোথায় যাচছো? শুয়ে থাকো না—

বাঃ! বাথরুমেও যাবো না? বুড়ো বয়সে কী হোল তোমার বলতো?

কিছু হয়নি রাধা। ফিরে এসে এক গ্লাস জল দিও আমাকে।

নিজে উঠে গিয়ে খাও না। এত হুকুম করো কেন? আমার শরীরটা ভালো নেই।

আগে তো এক গ্লাস জল দিতে—ঘুম ভাঙলে—

এখন আমার বয়স হয়নি? তার ওপর তোমার কথায় বড়ি খেয়ে খেয়ে আমার শরীরের হাল দেখেছো? মেঝেতে পা ফেললে ঝন্ করে চিলিক দিয়ে ওঠে। তলপেটটা ভারি হয়ে যাচ্ছে।

বীরেন মনে মনে বললো, আমি তো ভীষণ লোভী। অন্যের শরীরের কষ্ট একদম বুঝতে চাই না। মুখে বললো, এ মাস থেকে বড়ি খাওয়া ছেড়ে দাও। আমি নিজেকে সংযত করবো। দেখো তুমি।

হুঃ! আর করেছো। আমরা কি চড়াই পাখি!

জানো। তুমি না রাধা এই সেদিনও চড়োই বলতে।

কখনো না।

ভঙ্গীটা এত ভাল লাগলো বীরেনের-সে পরিষ্কার বললো, এসো না রাধা—খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকি। চিৎ হয়ে। দু-জনে।

তুমি সেই পাত্তর। শেষরাতে শবাসন করবে। আর চার পাঁচ বছর পরে হয়তো তোমার ছেলের বউ আসবে।

তা আসুক রাধা। আমি ততদিনে সাধু হয়ে যাবো। আসল মুস্কিল কি জানো। এত কম বয়সে আমরা বিয়ে করে বসে আছি—সেই কোন্ ত্রেতা যুগে আমাদের দুটি ছেলে হয়েছিল—কবে সেসব কথা ভুলে গেছি। কেউ আর আমাদের মাঝখানে অয়েল ক্লথে শোয় না।

বড় দুঃখ! মুতে ভাসায় না? ভোরবেলা ভিজে কাঁথা রোদে দিতে হয় না? তাই না!

একটা যদি মেয়ে হোত আমাদের এখন।

খুব আহ্লাদ—তাই না? তোমার পেটে হোক।

রাধা বাথরুম থেকে ফিরলে বীরেন বললো, তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ক-দিন হোল দীনুর চিঠি এসেছে।

তোমার অফিসের ঠিকানায়?

হ্যাঁ।

কেন?

হয়তো ফিল্ডে রয়েছে বলেই অফিসের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছে। তোমায় বলতে ভুলে গেছি—দীনুকে কী এক মশা কামড়েছে—

কোথায় আছে? আগে বলোনি কেন?

ডোংগড়গড়ের জঙ্গলে? সেখানে কি একটা মশা কামড়ালেই নাকি জায়গাটা পেকে যায়।

সর্বনাশ। ডোংগড়গড় কোথায় গো?

আমিও তো জানিনা রাধা। পেকে গিয়েছিল কয়েক জায়গা। দীনু চিন্তা করতে বারণ করেছে আমাদের। আমরা যেন না ভাবি—তাই লিখেছে। ও মশা কামড়ালে নাকি জায়গাটা পেকে গিয়ে ভেতরে শাস হয়ে যায়। শাস তুলে ফেললে অবিশ্যি চিন্তা নেই।

তুলে ফেলতে পেরেছে?

হ্যাঁ। আমার ছেলে তো। খুব জ্বর হয়েছিল দু-দিন।

কী লোক বলতো তুমি ? এসব কথা চেপে রেখেছো ? বলোনি কেন আগে ?

আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

নিজের ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে তার কথা কোন বাপ ভুলে থাকতে পারে ? কী ধারার বাপ গো তুমি ?

কেঁদো না। আমি বাপ তো—এ ব্যাপারেও তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি ?

আবছা আলোয় বীরেন উঠে বসে এ প্রশ্ন করায় রাধা তার স্বামীর মুখে তাকালো। এত সিরিয়াস হয়ে যাচছো কেন বলতো ? তুমি তো দীনেশের বাবাই—এ কথা কে সন্দেহ করবে ? তোমার কী হয়েছে ওগো ?

বীরেন মনে মনে বললো, যাক্। এ রাউণ্ডটা জিতে গেলাম। রাধা আমার ভেতরকার মন নিয়ে খোঁজ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই তো একটা বড় ভিকট্রি। বীরেন অন্যদিকে মুখ করে রাধার কথার জবাব দেবার আগ্রহের অভাব প্রমাণ করতে চাইল। পুরোপুরি না পারলেও —একটা জিনিষ ভেবে তার খুব স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছিল। আমি একটু আগে খুক্ খুক্ শুনেছি রাধার মুখে। রাধা মনোযোগ দিতে চাইছিল না।

ভাগ্যিস স্টকে দীনুর চিঠিটা ছিল। সেই ভয়ংকর মশার কথাটা ছিল। ভাগ্যিস ভুলে যাওয়ায় রাধাকে আগে বলা হয়নি। আগে বলে ফেলে থাকলে এমন সময় কি বলতাম। কি আর বলার ছিল আমার ?

মশারির বাইরে রক্তখোর যেসব মশা এখন কলকাতায় ঘুরছে—তারাও যদি একদিন অমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে—তাহলে ডোগংড়গড়ে দীনুকে চিঠি লেখা যাবে। বাবা দীনু। তোমার মাকে এবং আমাকে এই মশাগুলি কামড়াইয়া শেষ করিয়া দিল। শরীরের সব জায়গায় শাস এখনো তোলা যায়নি বাবা।

কি হয়েছে তোমার ?

রাধার হাতের পাতা ঠাণ্ডা। এইমাত্র আমার পিঠে রেখেছে।

জল দিয়েছি তোমাকে ?

না। কোথায় আর দিলে।

ক্ষমা করো। এখুনি নিয়ে আসছি—বলে রাধা মশারির বাইরে চলে গেল। দীনুকে চিঠি দিয়েছো ?

দিয়েছি। বলে বীরেন নিজের মনে মনে বললো, উঃ! কী আনন্দ। এরকম কতকাল হয় না। আমার মুখের চেহারা বিভ্রান্ত, বিমূঢ় টাইপের করতে পারলেই—

বীরেন জল খাবার পর রাধা আবার জানতে চাইলো—কি হয়েছে ওগো ?

কিছু না। বলে থেমে থেকে বীরেন আবার শুরু করলো। ডোংগড়্গড়ের মশাগুলো অমন হয়ে গেল শেষে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর এক হাত নিচেই রাস্তার ও-পিঠে কোটি কোটি শুঁড়ওয়ালা পোকা। খুব হাই প্রোটিন। ভেজে বা পুড়িয়ে—

কী বাজে বকছো ? ওগো! বলে দু' হাতে রাধা বীরেনের গলাটা জাপটে ধরলো। কী হলো গো তোমার ?

কাঁদছো কেন রাধা। কত শতশত কোটি পোকা—একজনের পিঠে আরেকজন। কখন ওরা মরে গিয়ে খসে পড়ে টুপ করে—তার কোন রেকর্ড নেই। ওদের তো কোন বংশ-তালিকা নেই। সবাই যদি ওরা বাথরুমের ঝাঁঝরি টপকে ওপরে উঠে আসে—ওঃ! আর ভাবতে পারছি না রাধা—

তুমি কাঁদছো ওগো ? তোমরা পুরুষলোক—

তিন

শ্রীচরণকমলেষু বাবা,

তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইও। মাকে দিও। আমরা এখন ডোংগড়্গড়ের ক্যাম্পে। তিনজন স্যার। চারজন কাজের লোক ও আমরা ষোলজন জিও-ফিজিক্সের স্টুডেন্ট লইয়া আমাদের এই ক্যাম্প। ক্যাম্পমানে আলাদা আলাদা চারটি তাবু পড়িয়াছে। আমি

চিঠি লিখিতেছি—তিন নম্বর তাঁবুর ভিতর বসিয়া—পেট্রোম্যাক্সের আলোয়। তিন নম্বর তাঁবুতেই আমাদের সঙ্গের যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। আমাদের তাঁবুর পিছনেই মাইল পনেরো দূরে শীলাডুংড়ি, নন্দডুংড়ি, আশাডুংড়ি—এইরূপ কত ডুংড়ি তার শেষ নাই—ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ। আমরা জিপ ভাড়া নিয়াছি। পরশু জঙ্গলের ভিতর দিয়া সাত মাইল দূরে নর্মদার তীরে গিয়াছিলাম।

কি বলিব বাবা—হঠাৎ জঙ্গল খুলিয়া গেল। জিপ বাঁক লইতেই দেখি আমরা ধূ ধূ কালো জলের সামনা-সামনি আসিয়া পড়িয়াছি। ওড়িশার মত এখানেও প্রচুর কেঁদ গাছ। গাছতলায় পাকা কেঁদ ফল খাইতে কিছু জলের পাখি ঝাঁক বাঁধিয়া নামিয়াছে।

এখানকার ভূ-ত্বকে পাললিক শীলা আজ হইতে অন্তত লক্ষ বছর আগে কোন অজানিত কারণে এই নর্মদা ট্রাককে চিড় খাইয়া এখানকার মাটিতে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটায়। ইহা স্টাডি করিতেই আমাদের এই ক্যাম্প। গাইগারমিটারের কাঁটা ঝাঁকুনী খাইয়া বহু বিচিত্র জিনিসের—ইতিহাসেরও আগের ইতিহাসের দিকে দিকনির্দেশ করিতেছে।

এই অব্দি পড়ে রাধা বললো, দীনু তো ভালো বাংলা শিখেছে।

চিঠিখানা কোথায় পেলে ?

তোমার বাইরে বেরোনোর জামার ঝুল-পকেটে। কিন্তু অসুখের কথা কোথায় লিখেছে ?

পড়ে যাও—

রাধা মনে মনে পড়ছিল। ভোরবেলার আলো ফোটার মুখে মুখে বীরেন ঘুমিয়ে পড়ে। তখন দু' কাপ চা করেছিল রাধা। পরপর কাগজ পড়েছে দু'খানা। ইংরিজি বাংলা। ঠিকেদারি ফার্মের লোক বলে বীরেনকে টেণ্ডারের বিজ্ঞাপনে আতিপাতি করে দেখতে হয়। বীরেন ঘুমোচ্ছিল বলে সে চা-টাও খেতে হয়েছে রাধাকে।

দীনু লিখেছে—

পড়ে যাও না।

নর্মদা তট হইতে ফিরিবার পথে আমরা একটু শর্টকাট করিতে গিয়াছিলাম। ফলে আরও খানিক বেশি জঙ্গুলে পথ দিয়া ফিরিতে হইতেছিল। জিপ বলিয়াই অমন লতা-পাতা, খানাখন্দ অগ্রাহ্য করিয়া ফেরা সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু পথে এক কাণ্ড ঘটিল।

আমরা খেয়াল করি নাই। জঙ্গলের কয়েকটি মশা আমাদের গোটানো হাতার বাইরে হাতে বসে। কিছু বসে ঘাড়ে। ফিরিতে না ফিরিতে ধুম জ্বর। সেই সঙ্গে কামড়ানো জায়গাগুলি দেখিতে দেখিতে ব্যথা ছড়াইয়া পাকিয়া উঠিল।

তিন স্যার বুদ্ধি করিয়া তখন তখনই একুশ মাইল দূরের এক বসতি হইতে পাকা ডাক্তার ধরিয়া আনেন। ডাক্তারবাবু আসিয়াই গরম জল চাপাইতে বলিলেন। ততক্ষণে আমাদের হাতে, ঘাড়ে পুঁজ জমিয়া গিয়াছে। বোরিক আসিল। কী টাটানো ব্যথা। ডাক্তার হাসিতে হাসিতে যেন ফোঁড়া কাটিতে বসিলেন। বোরিক কমপ্রেস। প্রায় চিমটা দিয়া পাকিয়া ওঠা জায়গা হইতে ভেতরকার শাস টানিয়া তুলিলেন।

ভোরের দিকে আমাদের সবাইয়ের জ্বর ছাড়িয়া গেল। ঘা শুকাইতে মাসখানেক যাইবে। আমরা এখন সবাই ফুল স্লিভের শার্ট পরিতেছি। ডাক্তারবাবু পরদিন ভোরে আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারিয়া তাঁর ডেরায় রওনা হইলেন। যাইবার সময় বলিলেন, শুধু ডোংগড়গড়ে এখনও এই মশা আছে। ইহাদের ভায়রা-ভাই থাকে ইথিওপিয়ায়। সেখানে তাহাদের চেহারা মাছির মত। নাম—সেরেটসে। ইথিওপিয়ায় বহু বুনো জন্তু এই সেরেটসের দাপটে অকালে প্রাণ হারায়।

পঞ্চাশ হাজার বছরে বহু বিবর্তনের ভিতর দিয়া ডোংগড়গড়ের মশার পরিবর্তন হইয়াছে অন্যত্র। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ডোংগড়গড় ডোংগড়গড়ই থাকিয়া গিয়াছে। উহারা পাল্টায় নাই। যেমন পালটায় নাই ইথিয়োপিয়ায়।

বাবা। একবার ভাবিয়া ত্থাখো। চতুর্দিকে পঞ্চাশ হাজার বছরের

বিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ঘটে নাই শুধু ডোংগড়গড়ে। প্রাণী জগতে ইহা কত বিরাট গবেষণার বিষয়। এখানকার শীলা, এখানকার ভূত্বক এবং এখানকার মশা আমার মনকে স্থির থাকিতে দিতেছে না। কোথায় সুদূর ইথিওপিয়া আর কোথায় নর্মদার কাছাকাছি কয়েকটি ডুংড়ি সাক্ষী এক অনামা জঙ্গল! এক সময়কার মাছি ও মশা একই মারাত্মক চরিত্র লইয়া পৃথিবীর দুই প্রান্তে টিকিয়া আছে। ভাবিলেও আশ্চর্য বোধ হয়। আমার একটি অনুরোধ বাবা—আমি পাশ করিয়া চাকরি করিব না। গবেষণা করিব—

ওগো। কী সব খটোমটো কথা লিখেছে। দীনু আমাদের বড় হয়ে গেল। তাই না?

এক কাপ চা দেবে?

নিশ্চই। অমন করে বলছো কেন ওগো।

রাধা চা করতে গেলে বীরেন লুকিয়ে লুকিয়ে রাধার পিঠ, পিঠের ভাজ ভালো করে দেখলো। বেণীটা আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে। ব্লাউজ আর বেণীর মাঝে একটি নরম লম্বা গলা। ওখানটায় যদি ইথিওপিয়ার সিরেটসে মাছি কিংবা ডোংগড়গড়ের রক্তচোষা মশা বসতো—তাহলে খুব একটা খারাপ হোত না বলেই বীরেনের ধারণা। মাঝে কোথায় যেন এই সেরেটসেদের কথা পড়েছিল বীরেন। বাংলা কাগজে? না, কোন ম্যাগাজিনে?

১৯৪৮ সালে সারা পৃথিবীর পেটের ভিতর জল নাকি শুকিয়ে আসবে। চাষবাসের জন্যে এত জল শোষা হয়ে গেছে! পৃথিবীর ফাঁকে ফোকরে জল জমলে সময় দেওয়া চাই। সে-বছর খুব বড় একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কারণ জলের অভাবে চাষবাস লাটে ওঠার দফা হবে। তাই একসপার্টরা বলছেন, ফুড হ্যাবিট পাল্টাতে হবে।

তাঁদের প্রস্তাব—আমেরিকায় প্রচুর বুনো মোষ রয়েছে। সেরেটসে মশার দাপটে ওরা অকালে পটপট মারা যাচ্ছে। এই মশা সাবাড় করে যদি ওই দুর্দিনের জন্যে ইথিওপিয়ার জঙ্গলের বুনো মোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা যায়—তাহলে অপর্যাপ্ত মোষের মাংস দিয়ে মানবসমাজের

পেট ভরানো যাবে। এবারের মত মানব সভ্যতা টিকে যাবে। তাছাড়া হাই প্রোটিন! এটাও একটা অ্যাডভানটেজ।

বীরেন ভাবছিল সে নিজে এক ঠিকেদারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মী। ওভারসিয়াররা স্যার বলে ডাকে। কারণ, বীরেনের হাত দিয়ে ওদের জন্যে পারসেনটেজে ঘুষ যায়। আবার পালা পার্বনের মুখে উপহারও পাঠাতে হয় সরকারী ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, বড়বাবু—মায় খোদ মন্ত্রী অব্দি। ঠারে ঠোরে। কখনো হাবা। কখনো ন্যাকা সেজে। খোসামুদির ভঙ্গিতে।

১৯৪৮-তে দেখা গেল একসপার্টদের কথামত সত্যিই দুর্ভিক্ষ এসেছে। বীরেন তখন ওভারসিয়ারদের বাড়ি বাড়ি ইথিওপিয়ার উদ্‌বৃত্ত মোষের মাংস পৌঁছে দিচ্ছে। সবাই তোলা তোলা করে খাচ্ছে। ডালনা। কষা। চাপ। কাবাব। দই-মোষ। কত কি!

রাধা চা নিয়ে এলে বীরেন জানতে চাইলো—আচ্ছা, মাছির নাম যদি সেরেটসে হয়—তাহলে মশার নাম সারাটসা রাখা যায়?

হঠাৎ ওদের নাম রাখত যাবে কেন? চান করে খেয়ে আপিস যাও তো।

না—মানে—আমি ডোংগড়গড়ের কথা বলছিলাম—

দীনুর কথা না বলে কতকগুলো মশার কথা পাড়ছো এখন সাতসকালে? আপিসে গিয়ে ছ্যাখো তো—লিভ ট্রাভেলের টাকা তুলতে পারো কিনা। তাহলে সাধনকে নিয়ে চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি আমরা।

যাবে? তাহলে চলো—আমরা সবাই মিলে খুলনা জেলা স্কুলে যাই—

আঃ! স্কুলে যেতে যাবো কেন শুধু শুধু। তোমার কি হয়েছে বলতো? তাও খুলনায় যাওয়া কেন?

খুলনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর। ওয়াশিংটন, নিউদিল্লি, মস্কো, প্যারি, খুলনা, পিকিং—

থামো বলছি। আমি এখন খুলনার একটা কথাও শুনবো না।

বিশ্বাস করো রাধা। আমাদের স্কুলের মাঠে অনেকগুলো বকুল গাছ

ছিল। নিশ্চয় এখনো আছে। তাদের কারও শেকড়ে কোন দিন আমি একটাও উইপোকা দেখিনি।

পোকার কথা থামাও তো।

জানো রাধা। আমাদের সঙ্গে ছোটবেলায় অনুকূল মিস্ত্রিরেব বড় মেয়ে গজিকোট খেলতো। আমি নাতুদির কথা বলছি—

কি নাম বললে ?

নাতু দিদি। হাঁটু ছাড়িয়ে ফ্রক পরতো। বিরাট ঘের। নাতুদি লম্বাও ছিল অনেকটা।

চুপ করো। আর শুনতে ভালো লাগছে না।

আমায় খুব ভালবাসতো নাতুদি। আমি বকুল ফুল কুড়িয়ে দিতাম। নাতুদি বুনো লতা দিয়ে মালা গাঁথতো। একদিন একটা সাপ বেরুলো বকুলতলায়। কি সাহসী। চেলাকাঠ দিয়েই নাতুদি পিটিয়ে মারলো সাপটাকে। বড়রা দেখে বললো, কি করেছিস নাতু। এ যে গোখরো। বড় হয়ে গেছিস। এখন আর আগানে বাগানে ঘুরিসনে। তাহলে তোর বিয়ে হবে না।

বিয়ে হয়েছিল ?

হ্যাঁ। বিয়ের পর বর নিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল। নাতুদিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু বরটা এত বিচ্ছিরি। হাফসার্ট হাফপ্যাণ্ট। পায়ে লাল কেডস। হাঁটু অব্দি হলদে মোজা। সবাই বলতো আবগারি হাবিলদার। টু পাইস নাকি ছিল। নাকের নিচে মাছিগোঁফ।

আবার মাছি ?

আমি অন্য কথা বলছি রাধা।

ছোটবেলার কথা এত মনে থাকে তোমার ?

যার শৈশব নেই—সে যেন প্রতিভার নদীতে সাঁতরাতে না নামে।

তোমার ওসব খটোমটো কথা বুঝিনে। লিভ ট্রাভেল বেনিফিট—কি আছে—অফিসে আজ দেখোতো।

ছুপুরে অফিসে যাওয়া মাত্র সাইট ইঞ্জিনিয়ার ডেকে পাঠালো বীরেনকে।

মিষ্টার দত্তগুপ্ত। একটা কঠিন কাজের জন্যে আপনাকে আমরা বেছে নিয়েছি।

বীরেন মনে মনে বললো, এ আর নতুন কথা কি! ভগবানই আমাকে বেছে নিয়েছেন। নয়তো এখানে পাঠাতেন নাকি?

মিষ্টার দত্তগুপ্ত। আপনি জানেন বোধহয়—ক্যালকাটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ইজ মোস্টলি আনচার্টাড। মানে আমাদের এই মহানগরীর পাতালের অনেকটাই আমাদের অজানা। কোন রেকর্ডস নেই। যে যেখান থেকে পারে কাজ করে গেছে। আমাদের কোম্পানী এখন এই বিরাট শহরের নানা যায়গায় পাইপ বসাচ্ছে আপনি জানেন।

হ্যাঁ স্যার। আমিও দু-একটা সাইটে গেছি।

রাইট। আপনাকে আরও যেতে হবে। কোম্পানীর স্বার্থে আমাদের আরও জড়িয়ে পড়তে হবে।

কোথায়?

এই মহানগরীর পাতালের সঙ্গে।

ওঃ। কিন্তু পোকাগুলো?

ওসব পোকা তো থাকবেই মানুষের এক্স্ট্রিকট্স থেকে পোকা তো হবেই। কিন্তু এই ময়লাই কলকাতার আশ পাশের ভেড়ির মাছেদের প্রধান ফুড মনে রাখবেন।

কিন্তু পোকাগুলো যদি ভেজে বা পুড়িয়ে—

তা কেন? দরকার মত আমরা সাইটে স্প্রে করে ওদের মেরে ফেলতে পারি।

হাই প্রোটিন।

কি বললেন মিষ্টার দত্তগুপ্ত?

হাইলি পয়জেনাস—। মানে বিষাক্ত।

বিষাক্ত ওষুধ স্প্রে না করলে তো ওদের মারা যাবে না। যা বলছিলাম। পাতালে রয়েছে অসংখ্য পাইপ। আগেকার গাঁথুনী করা নালী। এখনকার হিউম পাইপ। কিছু লোহার নল। জলের লাইন। ইলেকট্রিসিটির লাইন। তারপর গ্যাসের পাইপ। ফোনের

লাইন—উপরন্তু মেট্রো রেলের ভেনটিলেশনের লাইন যাবে। ভাবুন একবার।

এ তো স্যার কলকাতার নিচে আরেকখানা শেয়ালদা মেইন ষ্টেশন।

কিছু ভুল বলেন নি। কিন্তু এই পাতালের কোন ম্যাপ নেই। লোকেশান নেই। কী দেখে আমরা এগোবো জানি না। বিশেষ করে ছুটো সাইটে আমাদের লোক পাইপ বসাতে গিয়ে টেলিফোন লাইন এমন বিকল করে ফেলেছে যে—আমরা দোষ স্বীকার করলে বহু টাকা গচচা দিতে হবে কোম্পানীকে।

কথা শুনতে শুনতে বীরেন দেখলো, এই উঁচু অফিস বাড়ির জানলা দিয়ে তার চোখের সামনে বিরাট এক চৌকো ময়দান—কয়েকটা গাছের মাথা —ফোর্টে সেনাপতির পতাকা পত পত উড়ছে। এই অবস্থায় সারা কলকাতা যদি পৌছতে পারতো। সবুজ। ছবির মত শান্ত। নির্জন। তাহলে হোতোই বা টেলিফোন বিকল। কি আর আসে যেত আমাদের। আরেকটা সাইটে সারা লোকালিটির ইলেকট্রিক লাইন সর্ট সারকিট হয়ে বসে আছে। মিস্ত্রি কাজে নেমে সব ঠিক করবে। তারপর আমাদের লোকজন কাজে হাত দেবে। ইলেকট্রিক শকের ভয় তো আছে। ষোলটা লোককে সাতদিন হোল বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হচ্ছে। এম ডি বলছিলেন—কী কলোসাল ওয়েস্টেজ! সত্যিই তো। এই ড্রেনেজ আমাদের বন্ধ করতে হবে।

আমি ইলেকট্রিকের কাজ জানি না কিন্তু।

আপনি জানবেন কেন মিষ্টার দত্তগুপ্ত! এর চেয়েও বড় গোলমাল বাঁধতে পারে। গ্যাসের লাইন আছে। আছে তিনরকমের স্যুয়ারেজ। তার ওপর হেলথ হ্যাজার্ড। হয়তো কোন পুরনো স্যুয়ারেজ ফেটে গিয়ে খাবার জলের সঙ্গে মিশে গেল। তাহলে তো কেলেংকারী। বিধানসভার অধিবেশন চলছে এখন। অপোজিশন ব্যাপারটা একবার তুললে হয়। অনারেবল মিনিষ্টার আমাদের টুঁটি টিপে ধরবেন তখন। কলকাতায় কলেরার এপিডেমিক লাগতে পারে। ধাঙড়রা সুযোগ বুঝে স্ট্রাইক করে ওয়েজ রিভিশন চাইতে পারে।

তাহলে তো মহা বিপদ।

বীরেনের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, বিপদ বলে বিপদ! সেই জন্যেই তো আপনাকে ডাকা। আপনাকেই আমরা বেছে নিয়েছি। আপনি এ প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কর্মী। আপনার আনুগত্য, আপনার নিরলস পরিশ্রম কোম্পানীর নজর এড়ায়নি। সময়মত কোম্পানীর দিক থেকে প্রসারিত স্বীকৃতির হাত আপনার সামনে এগিয়ে আসবে।

বীরেন তাকে আচমকাই থামিয়ে দিল। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

থতমত খেয়ে সাইট ইঞ্জিনীয়ার বললো, কি কথা ?

আপনার পাশের ওই টেলিফোনটা তুলে দেখুন তো।

কেন ?

দেখুন না। বাইরের একটা লাইন চান।

সাইট ইঞ্জিনীয়ার আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললো, কেন বলুন তো ?

তুলুন না। বাইরের নম্বর চান একটা।

বাইরে কোথায় ?

চান না হাওড়া এনকোয়ারি—

পি বি একসকে বলতেই ওপাশ থেকে হাওড়া এনকোয়ারি বললো, হাওড়া বলছি। বলুন ?

সাইট ইঞ্জিনিয়ার কিছু না বলে—বীরেনের দিকে তাকালো। কি বলবো বলুন ? কোন ট্রেনের টাইম জানতে চান ?

না না। ওকে কিছু বলতে হবে না। দেখুনতো রিসিভারে কোন খারাপ গন্ধ পাচ্ছেন কি ?

নাঃ। হপ্তায় একবার লোক এসে সুগন্ধী করে দিয়ে যায় তো।

সে গন্ধ এলে চাপা থাকতো না। তার মানে স্যুয়ারেজ লিক করেনি। সব ঠিক আছে।

সাইট ইঞ্জিনিয়ার চমকে ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। বীরেন বাধা দিল। করছেন কি ? নামাবেন না। কান দিয়ে গন্ধ শোকা যায়। বাইরের লাইন তো। কানের দিকটা মুখের কাছে আনুন।

সাইট ইঞ্জিনিয়ার বীরেনের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। একদম ঘাবড়ে গিয়ে কানের দিকটা মুখের কাছে আনলো। তার মানে?

এবার শুঁকে দেখুন তো। কোন খারাপ গন্ধ?

না। একদম নরমাল।

তাহলে হাওড়ায় স্যুয়ারেজ ঠিক আছে।

কোন লিক হয়নি কোথাও।

ইঞ্জিনিয়ার রাগে রাগে ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে রাখলো। কি আবোল তাবোল বকছেন? যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। দরকার হলে আজই আপনাকে ওড়িশায় যেতে হবে!

শুধু শুধু কেন ওড়িশায় যাবো?

কারণ আছে। এরকম একটা একস্ট্রা-অর্ডিনারি অবস্থায় আপনার মত লোককেই আমরা বেছে নিয়েছি।

ব্যাপারটা কি খুলে বলুন না। সেই থেকে শুধু পাঁয়তারা ভাঁজছেন। আমি পুরো বিপর্যয়টা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাইছিলাম।

বলুন। তার আগে বলুন—কে কলকাতার পাতালকে ঠিকঠিক চেনে?

রাইট। আমিও এই পয়েন্টে এখুনি যাচ্ছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন লাস্ট সেঞ্চুরিতে এই শহরে এক সময় পালকি চলতো।—যখন ঘোড়ার গাড়িও ছিল না।

তখন তো ডিঙিও চলতো।

আমরা জলপথে যাচ্ছি না এখন। আমি পালকিতেই থাকতে চাই মিষ্টার দত্তগুপ্ত। সেই পালকিও একদিন উঠে গেল। তখন আরও দ্রুতগামী যানবাহন এসে যাচ্ছে। কলকাতা বড় হচ্ছে। হগ্ সাহেব বাজার বসিয়েছেন। তিনিই শহরবাসীর সুবিধার জন্যে মাটির নিচে ঢাকা নালীপথ তৈরি করাচ্ছেন তখন। কোন গন্ধ ছড়াবে না বাতাসে। জীবন আরও স্বস্তির হবে। কিন্তু পালকি উঠে যেতে যারা বেকার হল—তারা কোথায় যাবে?

আমি তো তখন জন্মাই নি। আমি জানব কি করে?

তাহলে আকবরের কথা এলিজাবেথের কথা জানেন কি করে ?

আমি কিন্তু খুব বেশি জানি না।

সাইট ইঞ্জিনীয়ার চোখ ছোট করে তাকাল খানিকক্ষণ। তারপর তোড়ে বলতে লাগল, জীবিকা অনুযায়ী কিছু কাগজপত্তর তো আপনাকে ঘাঁটতেই হবে। আমি বই খাতা নেড়ে-চেড়ে যা জেনেছি—তা হল—পালকি উঠে যেতে এই বেকার লোকেরাই ঢালাওভাবে হগ সাহেবের কাছে কাজ পায়। হগ সাহেবই তাদের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দেন। এরা অনেকেই ওড়িশা থেকে এসে এখানে থেকে গিয়েছিল। এরাই তখন কলকাতার প্রথম সুয়ারেজ গড়ে তোলার কাজে সামিল হল।

আসল কথাটা কি ? সেইটে বলুন না ?

কলকাতার পাতালটা—এদেরই বাপ থেকে ছেলে—ছেলে থেকে নাতির নখদর্পণে। এরাই জানে তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে বর্ষায় কতটা জল জমে। গ্যাসের মেইনটা কোথায় ওখানে ? উনিশশো সাতাশে যে যে লোহার পাইপ বসেছিল—তার পাশে কি আর পাইপ বসাবার জায়গা আছে ?

বেশ তো—

ওদের মাথার ভেতরেই কলকাতার পাতালটা খেলে ভাল। বাবার মুখে ঠাকুর্দার মুখে শুনে শুনে এখন ওরা বলতে পারে—মেট্রো রেলের ভেন্টিলেশনের লাইন গ্যাস পাইপ থেকে দূরে রাখতে হবে। নয়ত মিশে যাবে। এই এদের আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে।

কেন ? ঠিকানা নেই ?

আছে ? ওরা ওখানে ছিল একশো বছরের ওপর। যেখানেই থাকুক—সেখানে ওরা দলা পাকিয়ে থাকবে। জগন্নাথ দেবের পুজো-আচ্ছা করবে। সাক্ষীগোপালের নামে পালা গাইবে। পুজো চড়াবে।

ওরা নেই সেখানে। আপনি একটু খোঁজ-খবর করুন। কোথায় যেতে পারে ? এই কলকাতাকে ওরা ভালবাসে। এখানেও কোথাও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। আবার দেশেও চলে যেতে পারে।

দেশের ঠিকানা ?

কটকের কাছাকাছি গাঁয়ের লোক ওরা। পাশাপাশি কয়েকখানা গাঁ

জুড়ে ওদের বসবাস। দরকার হলে আপনাকে সেখানেও যেতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে ওদের। জানতে হবে—কেন এত বছরের ডেরা ওরা পাল্টাল ? প্রয়োজনে গর্ভমেন্ট ওদের পাশে দাঁড়াবে। আশা করি আপনাকে সব আমি বোঝাতে পেরেছি। ক্যাশে বলা আছে। আপনার দরকার মত টাকা তুলে নেবেন। ভাউচারগুলো অবশ্য রাখবেন। আজকাল জানেন তো অ্যাকাউন্টস কি জিনিস।

আমি যদি কটকের কাছাকাছি ওসব গাঁয়ে না যাই।

অফিস আপনাকে এ জন্যেই বেছে নিয়েছে। এখনকার ছেলে-ছোকরা তো বোঝেন আপনি। কেউ আপনার মত থরো নন। ওদের কলকাতার ঠিকানা আর কটকের রেলবাজার বাস স্টপ থেকে কী করে ওদের গাঁয়ে যেতে হবে—সবই টাইপ করে আপনার জন্যে রাখা আছে। আশা করি সাকসেসফুল হবেন।

বীরেনকে আর কথা বলতে না দিয়ে সাইট ইঞ্জিনীয়ার গট গট করে গিয়ে তার নিজের কিউবিকেলে ঢুকে পড়ল। ওসব ঘরে গিয়ে নিজের ঘূর্ণী চেয়ারে বসতে না পারা অব্দি ওরা ওদের পার্সোনালিটি ফিরে পায় না। বীরেন ম্যানেজমেন্টের ওপর একখানা বই পড়তে গিয়ে জেনেছে—একে বলে বিল্টইন পার্সোনালিটি। কিংবা এক কৌটো ইন্সট্যান্ট ব্যক্তিত্ব।

অফিসের পর সন্ধ্যেবেলাতেই বীরেন ওদের ডেরায় গিয়ে হাজির হল। মন্দ লাগছিল না। ঘোরাঘুরির জন্যে নগদ সাড়ে চারশো টাকা। আর সাত দিন অফিসে যেতে হবে না। ফাইন!

এ জায়গাটা বীরেনের চেনা। ভবানীপুরে একসময় যে ঘোড়ার আস্তাবল ছিল—তার পেছনে। কাছেই আশুতোষ মুখার্জির বাবার নামে রাস্তা। এখানে একটা চায়ের দোকান ছিল। এখন সেখানে রূপোর গয়নার দোকান। দোকানী রাজস্থানী—কি বিহারী—দেখে বোঝা যায় না। ওই চায়ের দোকানে এদিককার সবচেয়ে বড় জিলিপি আর সিঙ্গাড়া পাওয়া যেত। শীতের সময়ে—ফুলকপির। বীরেন খেয়েছে। দামও সস্তা ছিল। দোকানীও ওরাই কেউ ছিল। ভীষণ ভদ্র। সাতে-পাঁচে

থাকার লোক নয় ওরা। সন্ধ্যের পর দোকানে বসেই গান গাইত কজন মিলে। তার ভেতরেই সিঙ্গাড়া আসছে। চা দিচ্ছে রীতিমত বড় খুরির চা।

খোঁজ করতেই রূপোর গয়নার দোকানী জানাল—পশুপতি তো ? ওরা ডেরা তুলে দিল। পাড়ার মস্তানরা বড় জুলুম করত। আজ এই পূজো। কাল ওই পূজো। মোটা চাঁদা চাই। আমাকেই তো সেলামী দিতে হল এ ঘরের জন্যে।

কথা হচ্ছিল অবিশ্যি হিন্দিতে। তার স্যাম্পেল অনেকটা এরকম—

ও লোক কাঁহা যা সকতে হ্যায় ?

এ তো কোই আন্দাজ নেহি হ্যায়—কোয় দেশমে গিয়া হ্যায় ?

এ ভি নেহি বোল সকতা—করিব পশুপতি কা চাচা নীলমণি এক দফে কহতা থা—ক্যা দেশ চলা যায়েগাঁ ?

আশপাশের অনেকেই বলল পশুপতি নীলমণি নিয়ে ওরা জনা চল্লিশেক এখানে ছিল। তিন-চারটে বাড়ির একতলা জুড়ে। হয়ত বাড়িওলাদের মদত ছিল মস্তানদের পেছনে। নয়ত ওরাও গেল—ভাড়াটেও বসে গেল ? মোটা সেলামী পেয়েছে নিশ্চয়।

বীরেন মনে মনে ভাবল—তাহলে এখন নীলমণি, পশুপতি অ্যাণ্ড কোংকে খুঁজে পাই কোথায় ? কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হয়। ফিরে এস। কলকাতা শয্যাশায়ী। তোমাদের সব দাবি মেনে নেওয়া হবে। হাতে টাকা না থাকলে জানাও। এম-ও যোগে টাকা পাইবে। সত্বর ফিরিয়া এসো। আবার চায়ের দোকান দাও। জগন্নাথের নাম গান কর। বড় বড় সিঙ্গাড়া বানাও। বড় বড় জিলিপি। কেউ যাতে মোটা চাঁদার জুলুম না করে তা আমরা দেখব। তোমরা করতাল বাজিয়ে সাক্ষীগোপালের পালা গাও। কিন্তু ফিরে এসো। তোমাদের মাথার ভেতরেই কলকাতার পাতালটা ভাল খেলে। তোমরা যদি আর না আস—যদি কলকাতার পিচ রাস্তার মলাটের নিচের একশো দেড়শো বছর ভুলে যাও—বা গুলিয়ে ফেল—তাহলে—আমরা—এই মহানগরবাসীদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে—একবার কি ভেবেছো ?

বীরেন অফিসের একখানা একশো টাকার নোট ভাঙ্গিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো।

চার

আমি জানিতাম—নারী মানে দেবী।

সেইভাবেই ভাবিয়া আসিয়াছি। ভালবাসা মানে—মায়াকাননের ফুল। দেখা যায়। ধরা যায় না। বলাও যায় না। জীবন করিতে গিয়া দেখিতেছি—ব্যাপারটি কিছু অন্য রকম। রাধাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলাম। আমাদের বিবাহে কিছু লোক খাইয়াছিল. পাকা রুই।

ফুলশয্যার রাত্রিতে রাধা কোন কথা বলিল না। চুপচাপ। হুঁ-হা দিয়া সে কাজ সারিল। বকিয়া মরিলাম আমি। কারণ আমি যে তাহাকে ভালবাসিয়া বসিয়া আছি। অনেক পরে জানিলাম—সে উহার ধার ধারে না।

আমাকে কেহ কিছু বলিয়া দেয় নাই। শিখাইয়া-পড়াইয়া তৈরী করিয়া দিবে—এমন কেহ আমার ছিলও না। তাই আনাড়ির মতই উত্তেজিত হইতাম। আনাড়ির মত নিস্তেজ হইয়াছি। এমনিভাবেই চলিতেছিলাম অন্যদিকে কোন খেয়াল করি নাই।

যেদিন খেয়াল হইল—সেদিনই জীবনের—নিদারুণ সত্য জানিলাম। নারী—আদৌ কোন দেবী নহে। বরং রক্ত-মাংসের—যেন আরও বেশি করিয়াই।

রাধা বেশ খিটখিটে এবং কেনই বা মোক্ষম সময়ে রসিকতায় ছুরিখানি অমন বাঁকাইয়া আমার চক্ষুর সামনে তুলিয়া ধরে—ইহা বুঝিতে বুঝিতে আরও জানিলাম—ভালবাসা অনেক পরে—দেবী প্রথমে মানবী এবং তাহাকে সেতার করিয়া বাজাইতে হইবে। সেই লহরায় তাহারই রাগ-অভিমান আগে খসিবে—তবেই না এই লহরা—একটি লহরা। নতুবা নয়। অন্যথায় সবই শূন্য। দেবীতে কালি মাখিয়া যায় তখন ভালবাসা তখন পুষ্ট পুঁইবিচি।

ইহা জানিতে পারিয়া মনে আমার আর শান্তি নাই। জীবনটাকে ভাবিয়া ছিলাম দর্শন। ঘটনাচক্রে হইয়া দাঁড়াইতেছে—মরনপোতা। এই নামে খুলনা শহরের প্রান্তদেশে একটি ভাগাড় ছিল। শহর আর বেনেখামার প্রান্তীয় সংলগ্ন। ছাই, পাঁক, শুয়োরের পাল, খেজুর গাছ আর পূরীষ প্রক্ষেপের নালা। অবশ্য কিছু দিন পরেই সেই সব নালা মাটিতে বোঝাই হইয়া যাইত। পূরীষ কিছু দিন পরে মাটি হইয়া যায়। চাষীরা আসিয়া কোদালে কাটিয়া সেই মাটি লইয়া যাইত। ভাল ফসলের জন্য।

আরও অন্য সব জায়গায় দেখিয়াছি—এই ভাগাড়ের নাম—ছাইগাদা। কলকাতার ছাইগাদার নাম ধাপা। এখন আমার নিজের জীবনকে ধাপা মনে হয়। কী আর থাকিল এই জীবনে। ভালবাসা যদি লহরা হইয়া দাঁড়ায়। দেবী যদি চাটি মারিবার ডুগি তবলা হয়—আর ভালবাসা শেষ পর্যন্ত জীবনের সব কটি কঠিন অঙ্ক করিবার কসরৎ হইয়া পড়ে—তবে জীবনে সুখ কোথায়?

আমার এখন শান্ত নির্জনে পাখি হইয়া উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কেননা জানি আজও গভীর রাতে সেই ছুচো কয়টি স্বাধীনভাবে আমার ঘরের মেঝেতে ঘুরিবে। খুটখাট জিনিসপত্র দাঁতে কাটিবে। অন্ধকারেই বুঝিতে পারিব—টেলিফোনের রিসিভারের পাশে দুই কুচি নীল চোখ জ্বলিতেছে। কিংবা ছুঁচলো মুখে বসান দুইটি চোখ—দুইখানি নীল কুচি হইয়া জ্বলিতেছে। অর্থাৎ আমায় দেখিতেছে। ইচ্ছা করিলেই খাটে উঠিয়া আমার পায়ের আঙুল আলুজ্ঞানে দাঁতে কাটিতে পারে। তবু রাধা আলুর চপে বিষ দিয়া ফাঁদ পাতে না। বাথরুমে এখন যদি গিয়া আলো জ্বালি—তো পলায়নপর আরসোলাগুলি ঝাঁঝরির দিকে যাইতে যাইতে থামিয়া দাঁড়াইবে। উহাদের ভায়রা ভাইগুলি এই রাস্তাঘাট ফুটপাথের মলাটের ওপরে স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যে কোন দিন গৃহস্থ বাড়িগুলির ঝাঁঝরি দিয়া ঢুকিয়া সারা কলকাতা মাড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। রাধা তো অন্তত এই আরসোলাগুলিকে স্প্রে করিতে পারে।

এরূপ অবস্থায় পশুপতি আর নীলমণি নিরুদ্দেশ। উহাদের পুরা দঙ্গলটি যে কোথায় উধাও হইল? মেট্রো রেলের নিঃশ্বাস ফেলিবার গলি-ঘুঁজিগুলি পাইপের গোলমালে যদি বুজিয়া যায়। উঃ! আমি আর ভাবিতে পারিতেছি না। ভালবাসার এই হাল। কলকাতার এই হাল। আক্রমনোদ্যত শত শত কোটি পোকা রাগে থম থম করিতেছে।

আমার এখন শান্ত নির্জনে পাখি হইয়া উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কোথায় যাই? একবার ইচ্ছা করে খুলনা জেলা স্কুলে যাই। সবগুলি জানলাই ফ্রেঞ্চ উইনডো। শিক নাই কোন। ভাবি—একবার আমি পাখি হইয়া ক্লাস থ্রিতে ঢুকি। বাঁ দিকের থার্ড বেঞ্চে বসি। সন্ধ্যায় সারা শহরে ব্লাক আউট। সকালে রোদ হাসে। দিন দুপুরে এ আর পি নকল আগুন নিভানোর মহড়া দিতেছে।

যদি আরেকবার। জীবনে আরেকবার—

কি হোল? আবার ডাইরি লিখছ বসে বসে? আলো নেভাও। আমার একটু যদি ঘুম হয়।

তুমি ঘুমোও নি রাধা?

ঘুমোতে দিলে কোথায়! আলো নেভাও।

নেভাচ্ছি। বলে খুব লজ্জার সঙ্গে বিনীতভাবে বীরেন নিজের ডাইরিখানা বিছানায় দাঁড়িয়ে মাথার কাছের তাকে তুলে রাখল। আজ প্রায় এক বছর পরে সে আবার ডাইরি লিখছে।

মশারির ভেতর ঢুকতেই রাধা বেড সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে দিল। নেটের মশারি। কয়েক জায়গায় ছারপোকা আর মশা টিপে মারার কালো রক্তের দাগ। আলো নিভলেও কালো দাগগুলো চোখের সামনে থেকে যায়। এটা লক্ষ্য করে দেখেছে বীরেন।

টেবিল ল্যাম্প ইউজ করলে পারো।

একটা কিনতে হবে রাধা।

এতক্ষণ কারেন্ট, কালি, কাগজ নষ্ট না করে যদি দীনুকে চিঠি লিখতে —তাহলে অনেক ভালো হোত।

ও এখন কোন ক্যাম্পে আছে—জানি না তো আমরা। ডোংগড়গড় তো ওরা ছেড়ে গেছে।

তুমি আবার ডাইরি লেখো কেন।

এমনি। ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে—তাই।

কে পড়বে ওসব লেখা?

কেউ না রাধা। হয়তো আমিই পড়বো বিশ বছর পরে। তখন এই এখনটা মনে পড়বে।

বিশ বছর বাঁচবো আমরা আর?

জানি না। বেঁচেও যেতে পারি হয়তো রাধা।

সে বাঁচার কোন মানে হয় না। বাত, কাশি, চোখে ছানি। আচ্ছা? কি রাধা?

তুমি তো বিখ্যাত লোক নও। তুমি ডাইরি লিখে কি আনন্দ পাও? তোমার মৃত্যুর পরে তো কেউ আর ও ডাইরি ঘেঁটে দেখবে না। বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত-র অপ্রকাশিত ডাইরি নাম দিয়ে কোন কাগজে তো ও ডাইরি ছাপা হবে না। তাহলে ওসব লেখা কেন?

সব কেনর জবাব নেই রাধা। ধরো—কোনদিন সাধন আর দীনু তো তাদের বাবার ডাইরি দেখতে পারে?

দেখে হাসবে। তারা জানে—তাদের বাবা কি।

ওঃ। তাই বুঝি। ধরো—তোমারও তো দেখার ইচ্ছে হতে পারে?

শুধু শুধু ইচ্ছে হবে কেন? আমি তো জানি তুমি কি?

ঠিক ঠিক জানো রাধা? আমি কে?

অত ধাঁধার কিছু নেই। অফিস অনুগত একটি বাঙালী প্রাণ তুমি। রোজ সকালে তিনশো গ্রাম কাটা পোনা কেন। সাতশো আলু। পাঁচ পয়সার কাঁচা লঙ্কা আর একটা পাতিলেবু।

আমি কি শুধু এই রাধা? ধরো আজ থেকে তিনশো বছর পরে যদি কেউ আমার ডাইরি দেখে এখনকার মানুষের ভালবাসার একটা চেহারা পায়?

ভালবাসা? তুমি? হাসালে! সত্যি আমি না হেসে পারছি না।

অন্ধকার মশারির ভেতর আটচল্লিশ ব্লেডের সিলিং পাখা হাওয়া পাঠাচ্ছিল। পাড়ার মোড়ে বেকারদের গুলতানী। কিছু জোর কথাবার্তা ভেসে আসছিল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাইন বোর্ড থাকবে—দিনে তিন বার চোলাই অবশ্য সেব্য। এখন যা মদ খাওয়া বেড়েছে। সবাই খাচ্ছে চারদিকে। এসব ভাবতে ভাবতেই বীরেন আবার বললো, কলকাতার কথা জানতে হলেও তো—

সে জন্যে ইতিহাস পড়বে লোকে। তোমার ডাইরি ঘাঁটতে যাবে কোন দুঃখে। তুমি কি ডাইরিখানা আমাদের জাতীয় সরকারকে উপহার দিয়ে যাচছো?

এ কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই বীরেন বললো, ধরো—

কি ধরবো? তোমার আছেটা কি?

আমি তো একটা মানুষ। আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম রাধা।

সে সব কবে ভুলে গেছি।

ধরো এখনকার এই সভ্যতাই মুছে গেল।

তুমি বলছো মহেঞ্জোদাড়ো হয়ে যাবে কলকাতা—?

হ্যাঁ। কলকাতার আণ্ডারগ্রাউণ্ড যদি এলোমেলো হয়ে যায়। যদি পাতাল থেকে কোন আক্রমণ আসে রাধা?

ভূমিকম্প? জলোচ্ছ্বাস? সমুদ্র এগিয়ে আসবে?

ধরো—তার চেয়েও বড় কিছু। ধরো মাটির নিচের সব পোকা যদি একদিন ওপরে উঠে এসে সবাই মিলে—শত শত কোটি পোকা এক সঙ্গে কলকাতাকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়?

পোকারা ম্যানহোল খুলতে পারে না।

যদি ঝাঁঝরি দিয়ে আসে রাধা?

যত পোকা বললে—অত কোটি পোকা সরু ঝাঁঝরি দিয়ে আসতে অন্তত এক হাজার বছর সময় নেবে। আর তার আগেই ওদের আমরা একা একা পেয়ে মেরে ফেলবো। প্রয়োজনে খেয়েও ফেলতে পারি। যে রেটে মাংসের দাম বাড়ছে—

এখন কত ?

ষোল টাকা কেজি। আর তোমার কথা মত এ সভ্যতা যদি মুছে যায় পোকার দাপটে—তাহলে তো আমাদের বর্ণমালাও মুছে যাবে। তিনশো বছর পরে কে তোমার ডাইরির মানে বুঝবে ?

ধরো রাধা—

আমি কিছু ধরতে চাই না। কাল তুমি কটক যাচ্ছো। সাধনের পরীক্ষা আছে। সকাল সকাল উঠতে হবে। তুমি বরং আমায় একটু ধরো।

বীরেন ধরে দেখলো। রাধার শরীরটা একটু গরম। তির তির করে কাঁপছে।

রাধা খুব আস্তে বললো, কোন তাড়াহুড়ো নেই। এটা তোমার নিজের বিছানা। আমি তোমার বউ। ধীরে সুস্থে এগোও।

মানব সভ্যতার পতনের মূল এখানেই নিহিত। বলতে বলতে বীরেন দেখলো, বিষাদ এসে অন্ধকারে ভিড় করছে।

আবার খটোমটো কথা ? ঝামরে উঠেই রাধা বহুকাল পরে নিজের থেকে বীরেনকে একটা চুমু খেল।

তাতে বীরেন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। রাধাকে জড়িয়ে দেখলো—কোন শেষ নেই। অমনি রাধা বললো, উহু। অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এটা তোমার নিজের ঘর। তুমি এখন নিজের বিছানায়। আমি তোমার বউ। অন্য কিছু মাথায় এনো না। লক্ষীটি। আজকের এই সময়টা অন্তত।

সেফ সাইডে থাকার জন্যে বীরেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্ত তার এই মধ্যবয়সে সুদূর অতীতের ক্লাশ নাইনে চলে গেল। খুলনা জেলা স্কুলে। থার্ড পিরিয়ডে। নন্দবাবুর ক্লাশ। চৌবাচ্চার অঙ্ক। একটা নল দিয়ে ঘণ্টায় এত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা নল দিয়ে ঘণ্টায় অত জল চৌবাচ্চায় ঢুকছে। চৌবাচ্চা ভর্তি হতে কত ঘণ্টা কত মিনিট কত সেকেণ্ড লাগবে ?

মাথা থেকে সব বের করে দিয়ে বীরেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্ত শুধু চৌবাচ্চা

ভেবে ভরে যেতে লাগলো।

অন্ধকার মশারি আরও অন্ধকার হয়ে গেল। লক্ষ্মীটি—বলে খানিক বাদে রাধা আজ আবার একটা চুমু খেল বীরেনকে। আজ যে তুমি কি ভালো—

রাধার কথা জড়িয়ে গেল। আর শেষ করতে পারলো না।

একদিনে দু' দুবার। তাও নিজে থেকে। বীরেন রিপ্লাই দিতে একদম ভুলেই গেল।

এই তো চাই! সব সময় মনে করবে—এটা তোমারই ঘর। আমি তোমারই বউ। অন্য কিছু মাথায় ঢুকতে দেবে না এ সময়ে। আজ তুমি কথা রেখেছো লক্ষ্মীটি—

এসব শুনে বীরেন নিজের মনের ভেতরে খুল খুল করে হাসতে লাগলো। এ ঘর আমার? কোথায়। সে কথা তো আমি আদৌ ভাবি নি। রাধা তুমি আমার বিয়ে করা বউ। একথাও তো আলাদা করে ভাবিনি আমি। এ বিছানা আমার? একথাও তো ভাবতে দিইনি আমার মাথাকে! লক্ষ্য করে দেখেছি—তোমার কথা, তোমার শরীরের ওম, তোমার শরীর। আর কাজে কাজেই সেই গরুচোর ভালবাসাটির কথা এ সময়ে মনে পড়লে আমি এতটাই অসতর্ক হয়ে পড়ি—যার দরুণ শেষ অব্দি তুমি তৃপ্তি পাও না। তাই আজ তোমার কথা মত আজ এখন আমি যা করলাম—তার নাম চৌবাচ্চার অঙ্ক। এর সঙ্গে ভালবাসা, শরীর, জীবনের কোন যোগ নেই। পুরোটাই তোমার চিন্তা থেকে—ভালবাসা থেকে দূরে থাকার জন্যে অন্যমনস্ক হওয়ার এক বিশাল ব্যায়াম বা চৌবাচ্চা ভরাটের বিপুল অ্যারিথমেটিক। মনে রাখতে হবে—এই একই চৌবাচ্চা আরেক নল দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। আসলে ওটা চৌবাচ্চাই নয়। এ হোল গিয়ে জলের খেলা।

রাধা। এই রাধা?

উ।

ঘুমিয়ে পড়লে এরই ভেতর?

রাধা জড়ানো গলায় কোন রকমে বললো আরও ডাইরি লেখো। লিখে

যাও। যত ইচ্ছে—

এবার বীরেন নিজের ঘরে—নিজের বিছানায়—নিজের বউয়ের পাশে একদম এক হয়ে গেল। সে এখন একা তার বউকে ভালবাসতে চায়। চাপ চাপ বিবাদ সরিয়ে দিয়ে বীরেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্ত তার ঘুমন্ত পত্নী রাধারাণী দত্তগুপ্তের কপালে অন্ধকারে আন্দাজে একটি অস্পষ্ট চুম্বন রাখলো।

তারপর নিজের মাথার নিচের উপাধানে মাথাটি রেখে চুপচাপ সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো। একটা স্নবিধে—এখন রাধা ঘুমোচ্ছে। —ঘরের সিলিং বা মশারির সিলিং—কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

বীরেন্দ্রনাথ নিজেই বলে থাকে—আমি বেশি বই পড়িনি। তার এই স্টেটমেণ্ট কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না সবাই জানে।

কিছু ডেভিড কপারফিল্ড। কিছু কাশীরাম। সীতারাম। সন্দীপ, স্নরেশ, অচলা। কয়েকখানা অশোক গুহর বঙ্গানুবাদ। তারপর চটি চটি—একটু সার্ত্রের গল্প। একখানা জন ডস পাসোস। ফাঁসোয়া সাগা। পুরানো কলিকাতার ইতিহাস। দি নেকেচ এপ। ইছামতী। ব্যাস। ছু'একখানা বোধহয় বাদ গেল। সব নাম মনে পড়ে না একসঙ্গে।

ফ্রাঁসোয়া সাগার খোলা এ সারটেন স্মাইল পড়েছিল—সে অনেক আগে। লেখিকা সম্ভবত বীরেনেরই বয়সী। কোন কাগজে দেখেছিল এখন সে জুরি হয়। সিনেমা উৎসবের।

কেন এই সময়ে হঠাৎ সাগার কথা মনে পড়লো। আরও অনেক বইয়ের কথা মনে পড়ছে বীরেনের। সাগার নায়িকা রোগা। তাকে মোটা হওয়ার জন্যে পাউরুটি খেতে বলা হচ্ছে। সে যে ছেলেটির সঙ্গে প্রেম করে—সেই ছেলেটি শরীর চর্চা করে। সুইমিং পুলে ছেলেটি মেয়েটিকে বললো, দেখেছো আমার ফিগার। ছাখো কী স্নন্দর মাসেল আমার।

মেয়েটি ভালবাসতে গিয়ে দেখলো—ছেলেটি নিজের শরীরকেই বেশী

ভালবাসে। তখন সাগার নায়িকা একদিন ছেলেটির খুড়োর সঙ্গে শুয়ে পড়লো। খুড়ো মধ্যবয়সী। খাটে ওঠার সময় খুড়ো এত সুন্দর-ভাবে পাজামাটি মেঝেতে ছেড়ে রেখে আসে। সেই কথা ভাবতে ভাবতে খুড়োর জন্যে নায়িকার মনে প্রেম এলো।

কে ?

আমি জঁা পল সাত্রে।

কি চাই ?

তুমি আবার আমার ইনটিমেসি গল্পটা পড়ে ছ্যাখো। তোমার পড়ে দেখা দরকার।

বীরেনের সন্দেহ হোল। আমি কি স্বপ্ন দেখছি! ঘুমিয়ে আছি ? না, জেগে আছি ? ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। সে কোনদিন সাত্রের কোন ছবি দেখেনি। চেহারাটা অচেনা।

মুখে বললো, পড়েছি। আপনার হিরো তার বউকে খুব ভালবাসতো। বউ চাইতো শরীর সমেত ভালবাসা। সেটা ভালভাবে পারতো না আপনার হিরো। তখন তাকে ছেড়ে বউ আরেকজনকে ধরলো। সেই আরেকজন রীতিমত দক্ষ। এই দক্ষতাই বউয়ের মনে বিরক্তি, ঘেন্না ধরালো। দক্ষতার ভেতর শরীর নিয়ে একটা যান্ত্রিক সাফল্য আছে। এই যন্ত্রবোধ বউকে অসুস্থ করে তুলতো। সে তখন আবার স্বামীর কাছে ফিরে গেল।

ঠিক বলেছো।

আপনি কিন্তু একটা কথা বলেননি।

কি বীরেন ?

ভালবাসা আসলে দখলের ইচ্ছে। একজনকে আরেকজনের অধিকারের ইচ্ছে। চক্ষু লজ্জায় তার নাম বলি ভালবাসা।

এসব কথা আমার গল্পটায় আছে বীরেন।

উহু নেই।

ইমপ্লয়েড অবস্থায় আছে বীরেন।

আরেকটা জিনিস আপনি ভেবে দেখুন সাত্রে মশাই। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী একভাব উপগত হয়। আর আমরা মানুষরা? মানে আমরা মানুষ নামে জন্তুরা?

আমাদের মাইণ্ড আছে বীরেন।

তাই আমরা মুখোমুখী উপগত হই। তাই বোধহয় দখলের অধিকার ফলাতে আমরা শরীরটাকেও বড় বেশি করে সঙ্গী হিসেবে দাবি করি। এজন্যে একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য চাই বীরেন।

নৈপুণ্যের আরেক নাম দক্ষতা। আর আপনিই তো লিখেছেন—দক্ষতার ভেতর যান্ত্রিক সাফল্য রয়েছে—যে-সাফল্য বিরক্তি জন্মায়—ঘেন্না তৈরি করে। যন্ত্রবোধ ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণা দেয়। তখন ভালবাসার ভেতর থেকে দখল, অধিকার—উঁকি দিতে থাকে।

তখন জীবন শুকিয়ে যায় বীরেন।

বীরেনের নাক আসলে তখন গর্জন করছিল। ডাক্তার বলেছে—পলিপাস হয়েছে। ছোট্ট একটা অপারেশন দরকার। কিংবা—হোমোপ্যাথি তিনমাস। একটানা। আপন আপনি ঠিক হয়ে যাবে। রাধার ঘুম ভেঙে গেল নাকের ডাকে। সে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে সাধনের সঙ্গে শুয়ে পড়লো। ছোট ছেলেটা কয়েক বছর হোল একা শোওয়া অভ্যেস করেছে।

রাত পৌনে চারটেয় বীরেনের ঘুম ভেঙে গেল। সে হিসেব করে দেখলো, ঠিক তিন ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট একটানা গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়েছিল। যাকে বলে নিশ্ছিদ্র ঘুম। স্লাম্বার। একটুও ক্লান্তি নেই শরীরের কোথাও।

এখন সে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে অন্তত আধঘণ্টা হাঁটবে। রোজকার মত পাতাল রেলের লোকজনকে আলো জ্বালিয়ে কাজ করতে দেখবে। কুমড়োর ঝাঁকা যাবে ফিকে অন্ধকার মাখানো রাস্তা দিয়ে। গায়ে ঘাম ফুটে উঠলে ফিরে আসে বীরেন রোজ। এই হাঁটাটুকু তাকে তাজা রেখেছে। একটু পরেই কাছাকাছি কোন্ মসজিদ থেকে মাইকে আজান ভেসে আসে। শেষরাতে সারা শহরে শুধু এইটুকুই আলো

ছড়িয়ে পড়ার আগে আগে অনেকদূর অব্দি ছড়িয়ে যায়।

আজও আজানের সুর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। বীরেন হাঁটতে হাঁটতে পাতাল রেলের লোহার জালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। নিচে জোরালো আলোয় ইস্পাতের বীমগুলোয় রিবেট মারা হচ্ছে। অল্পবয়সী একজন —ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে—তার কাছে বীরেন জানতে চাইলো, এতটা গর্ত খুঁড়ছেন। পাশের এসব ফ্লাটবাড়ি হেলে পড়বে না তো?

ছোকরা তাকে ভ্রূক্ষেপই করলো না।

বীরেন তখন আরেকটু এগিয়ে আরেকজনের কাছে গেল। লোকটা মিস্ত্রি মত। হাতে একখানা হাল্কা যন্ত্র। এরকম জিনিস বীরেন আগে কোনদিন দেখেনি। জলের পাইপ, টেলিফোন লাইন—সবই তো দফারফা অবস্থা?

লোকটি অবাক হয়ে তাকালো, কেন? তা হবে কেন? আমরা সব বাঁচিয়ে কাজ করছি।

এক লাইন জুড়তে গিয়ে আরেক লাইন যদি কেটে যায়—

রিপেয়ারের করিডর রাখা হচ্ছে।

পরে মনে থাকবে?

আমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কলকাতার ম্যাপ তৈরি করাচ্ছি। একটু থেমে লোকটি বললো, পাবলিক এই ভয় পাচ্ছে—আমরা জানি। কিন্তু অত ভয়ের কিছু নেই আসলে।

বীরেনের একদম বিশ্বাস হোল না কথাটা। এমনিতেই এ-লাইন সে-লাইনে গোলমাল হয়ে যায়। তারপর আবার মেট্রো রেল। তার সিগন্যাল, ব্লক, রিলে, ভেন্টিলেশন—কত কি। গোলমাল হবে না মানে!

আরও খানিকটা এগিয়ে বীরেন একদম অন্ধকারের ভেতর পড়ে গেল। কাজ হবে বলে মেট্রো রেল সবে ঘিরে রেখেছে। এখনো খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়নি। টিনের ঘরের ভেতর থেকে জাঙ্গিয়া পরা দুই ছোকরা বেরিয়ে এলো। হাতে ছুরি। একদম সামনে এসে বললো, চেঁচালেই

পেটে বসিয়ে দেব। হাতঘড়িটা দিন তো আগে—

একদম চমকে গেল বীরেন। বাড়ির এত কাছে ছিনতাই হয়ে যাবে? ভাবতেও পারেনি বীরেন।

লিক লিক করছিল ছুটো অন্ধকার। বীরেন ধা করে সামনেরটার পেটে এক লাথি কষালো। অমনি বাবাগো বলে সেই অন্ধকারটা টিনের ঘেরে শব্দ করে ঢলে পড়লো। বীরেন তক্ষুনী একটা চড় কষালো বাকি অন্ধকারকে। সে-ও ঘুরে পড়লো।

ছুটে গিয়ে বীরেন তাদের সামনে দাঁড়ালো। কাউকেই উঠতে দিলো না। এত সাহস? আমাকে ছুরি দেখানো? বলতে বলতে বীরেন ওদের পালা করে লাথি, কিল, ঘুষি দিতে লাগলো।

একজন অন্ধকার তো কেঁদে কঁকিয়ে উঠলো। ছেড়ে দিন বাবু। আর কোনদিন করবো না।

আরেকটা লাথি।

উঃ। বাবাগো। মেরে ফেলুন বাবু! মেরে ফেলুন আমাকে—

আর কোনদিন করবি এমন?

কোনদিন না।

যাঃ। পালা। ছোট। কোনদিকে তাকাবি নে—সোজা ছুটে যা—

পাই পাই করে ছুটো লিকলিকে অন্ধকার আরও অন্ধকারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তখন বীরেন হিসেব করে দেখলো আধঘণ্টার হাঁটা হাঁটিতে যেটুকু ঘাম ফুটে ওঠে গায়ে—তা অলরেডি হয়েছে। অতএব— আজ আর হাঁটারই দরকার নেই। একেই কি যান্ত্রিক সাফল্য বলে? নৈপুণ্য? দক্ষতা?

বাড়ি ফিরে বীরেন দেখলো, তার ভাড়াবাড়িটা একদম ঘুমের দেশে আছে। যদিও রাধা এখন ওঘরে—তবু আলো জ্বালতেই জেগে যাবে ঠিক। তার চেয়ে

আন্দাজে বুক র‍্যাক থেকে ছু'খানা বই নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসলো বীরেন। বারান্দায় এখন ফুটি ফুটি আলো। ওপরের বইখানা বিভূতিভূষণের ইছামতী। পয়লা পাতাতেই লেখা—

১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েছে সবে।

পথঘাটে তখনও কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখী বসে আছে বাবলা গাছের ফুল ভর্তি ডালে।

নালু পাল মোল্লাহাটির হাটে যাবে পান সুপুরি নিয়ে মাথায় করে। মোল্লাহাটি যেতে নীলকুঠির আমলের সাহেবদের বটগাছের ঘন ছায়া পথে পথে। শ্রান্ত নালু পাল মোট নামিয়ে একটা বটতলায় বসে। গামছা ঘুরিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো।

বীরেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্ত এইখানে থেমে আকাশে তাকালো। তারাগুলোর সব তখনো মোছেনি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে একদিন খুলনা জেলা স্কুলের ক্লাশ থ্রি-তে বসে সে শুণেছিল—বাংলা ১২৭০ সনে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। কোন্ স্যার যেন বলেছিলেন। তিনি নাকি প্রত্যক্ষদর্শিনী তাঁর কোন ঠাকমার মুখে সে বন্যার কথা শোনেন। পরে বীরেন—অনেক বার মনে মনে হিসেব করে দেখেছে—ওই বন্যার সময় বিবেকানন্দের জন্ম হয়। জন্ম হয় তার নিজের দাদামশায়ের।

এই যে কমাস আগে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বৃষ্টি আর বন্যা হয়ে গেল—তার আগের সবচেয়ে বড়টা তাহলে ১২৭০-এ হয়েছিল? তখনকার পথের কাদা, ফিঙ্গে পাখী, বাবলা ডালের ফুল কবে মুছে গেছে। বাতাসে লুকানো রয়েছে তখনকার সব দাগদাগালী। নালু পাল, গাছের ছায়া, ঘুরন্ত গামছার বাতাস সবই এই পৃথিবীর বাতাসে—ধুলোয় চাপা পড়ে আছে। চেষ্টা করলে খুঁড়ে বের করা যায়। কিন্তু কি হবে? সময়ের ভেতর সবই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে আছে।

আমার আজ ভোরের ব্যাপারটাও তো সময়ের ভেতর জায়গা করে নিয়েছে এতক্ষণে। নানা ঘটনার গুঁড়ো দিয়ে দিয়ে সময় তৈরি হয়। ছুটো লিকলিকে অন্ধকার আরও গাঢ় অন্ধকারে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যেমন এখন আলো ফুটে ওঠায় তারাগুলো মুছে যাচ্ছে। চাঁদের এখন শুধুই আউটলাইনটা পরে আছে আকাশে। এ কি আলোর নৈপুণ্য? না, অন্ধকারের দক্ষতা?

এইতো সেদিন শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বৃষ্টি—বড় বন্যা গেল। সরকারী হিসেবেই সাত-আটশো মানুষ সাবাড়। ১২৭০-এ না জানি কত সাবাড় হয়েছিল। কত ইচ্ছা, কত হাসি, কত কলরোল সময়ের দাঁতে, বন্যার দাপটে শেষ হয়ে গেছে। বীরেনের তবু মনে হয়—এই বাতাসেই সেই ইচ্ছা, সেই কলরোল মিশে আছে। সময় শুধু চাপা দেয়। মুছতে পারে না পুরোপুরি।

আকাশ বেশ ফরসা হয়ে আসছিল। আজই বীরেন কটক যাবে। পশুপতি-নীলমনিদের খোঁজে। অন্য বইটা নাড়তেই দেখলো, পাতাগুলো ঝুরঝুরে। আগেকার টাইপে বইয়ের নাম—

পুরানো কলিকাতার ইতিহাস

বইটি ১৮৭৪ সালে ছাপা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় বীরেনের চোখ আটকে গেল।

কলিকাতা ময়দানে পুকুর কাটিবার সময় চার বা পাঁচ ফুট নীচে মৃত সুন্দরী বৃক্ষকে খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখাগিয়াছে। ব্যাপকভাবে জমি বসিয়া যাওয়ার ফলে ইহা ঘটিয়াছে।

ফোর্ট উইলিয়মে ৫০০ ফুট গভীর কুয়া খননের সময় এমন কিছু নিদর্শন নীচে পাওয়া গিয়াছে—যাহাদের থাকার কথা ভূপৃষ্ঠে।

সম্রাট আকবরের সময় সমগ্র বাঙ্গালার উপর দিয়া ব্যাপক বন্যা বহিয়া যায়। জনপদ, বনজঙ্গল ভাসিয়া যায়। কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র ছিল না। অনেকের ধারণা—সেই সময় সুন্দরবন সমেত ব্যাপক অঞ্চল মাটির নিচে বসিয়া গিয়াছিল।

বীরেনের মনে পড়লো, সে-যখন খুলনা জেলা স্কুলের ক্লাশ থ্রিতে থার্ড বেঞ্চে বসে বাংলা ১২৭০ সনের বন্যার কথা শুনেছিল—তখনো এই বয়স বন্যার এখনকার মত এতখানি হয়নি—যাতে কিনা অতিরঞ্জন, দূরত্ব সব মিশিয়ে ১২৭০ ইতিহাসের গন্ধ আর রহস্য মেখে নিয়ে এতটা হয়ে উঠতে পারে। রাধা ঘুমোচ্ছে। সাধন ঘুমোচ্ছে। কাজের লোক এখনো আসেনি। সকালবেলার আলোয় শীত থাকে। কাজের লোক

এসে চা করবে বলে বীরেন সদর খুলে ভেজিয়ে রাখলো।

আকবরের সময় তুলসীদাস রামচরিত মানসের দোঁহা বাঁধছিলেন। সেক্সপীয়র তখন লেখে। এলিজাবেথের ভি ডি হয়েছে। ডেকের পালতোলা জাহাজ দার্দানেলসে। এমন সময় বান এলো। হয়তো ১৯৭৮-এর মত উত্তর ভারতে নাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল। সেই জল নদী বেয়ে চলে এলো দু'তিনদিনে। তারপর বিরাট উঁচু হয়ে জল যখন ঝাঁপিয়ে পড়লো এখানকার ভাঙায়—তখন জলের কোটি কোটি টন ওজনে মাটি বসে গেল। বসতি, মানুষজন, মন্দির, গাছ সমেত। খাড়াই গাছ কয়েকশো বছরে চাপা মাটির নিচে কয়লা হওয়ার পথে। এ যে একদম জ্যান্ত কবর। মাটি খুঁড়লে তাদের শেষ নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে আসে প্রথম।

আজই শেষরাতে যদি সারা কলকাতার ঝাঁঝরি দিয়ে এই মহানগরীর মলাটের ও পিঠের তাবৎ পোকা শহরে ঢুকতে থাকে—তাহলে কাল বেলা দশটা নাগাদ মাটির ওপরকার ঘরবাড়ি সমেত মাটি বসতে শুরু করবে। এ যে জলের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ, জলতো দাঁড়ায় না। বহে যায়। পোকা যে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবে।

শত শত কোটি পোকার চাপে জানাশোনা পৃথিবীটা তলিয়ে যেতে থাকবে। বোটানিকস্ মাটির নিচে। সেই মাটির ওপর গঙ্গা ছলাৎ ছলাৎ। চিড়িয়াখানার বাঘগুলো দমবন্ধ হয়ে মরণ কষ্ট পেতে পেতে খাচা সমেত মাটির নিচে। ভিক্টোরিয়ার হাইড্রেন শুধু পার সমেত বেরিয়ে থাকবে ওপরে। আমার ডাইরিখানা এ-বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবে। কী বিশাল মৃত্যু অসংখ্য অর্বুদ পোকার চেহারা নিয়ে কলকাতার মলাটের ওপিঠে থম থম করছে। ওরা শুধু স্যাম্পেল হিসেবে ঝাঁঝরি দিয়ে কলকাতার এপিঠে কিছু আরশোলা পাঠায় নিশুতি রাতে। বীরেনের মনে হল—এইভাবেই হয়তো ওরা আমাদের একটু একটু করে যাচাই করে আসছে। সামান্য সামান্য মৃত্যু আমাদের দিয়ে এইভাবে চাকিয়ে নিচ্ছে। তারপর একদিন আকবরের সময়কার বিশাল বন্যার মতই থাক থাক পোকার চাপে মৃত্যু ঘনিয়ে

আনার জন্যে ওরা নিজেরাই চেঁচিয়ে বলবে—গেট রেডি। হেয়ার ইজ ডেথ এ্যাট ইউর ডোরস্টেপস। উই ডেলিভার ইন্সট্যান্ট ডেথ্! ডেথ বাই সাফোকেশন। চাপা দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু। পলকে মৃত্যু। মৃত্যু অবধি শ্বাসরোধ। তারপর তো অনন্ত অন্ধকার। এই সময়টায় পোকাদের আর ঝাঁঝরির চক্ষুলজ্জা থাকবে না একটু। পৃথিবীর মলাট নানা জায়গায় ফুটো হয়ে থাকে—আর সেসব ফুটো দিয়ে পোকারা গল গল করে মলাটের এপিঠে চলে আসবে।

কোথায় যেন শুনেছে—না পড়েছে ঠিক মনে পড়লো না বীরেনের।— গত দশ হাজার বছর ধরে দক্ষিণ মেরুতে একখানা বিরাট চাঙ একা একা রওনা দিয়েছে। সাইজে তা ইউরোপের সমান। আগাগোড়া জমাট বরফ। বছরে কয়েক সেন্টিমিটার করে সরে আসছে। জলের নিচেই প্রায় তার সবটা। বাকিটা জলের ওপর। গতি বাড়লে মেরুর মায়া ছেড়ে এই অতিকায় যম সমুদ্রে গিয়ে পড়লে বরফ গলতে শুরু করবে। শুধু জলের ওপর জেগে থাকা বরফ গললেই সারা পৃথিবীর সমুদ্রের জল দু'শো ফুট উঁচু হয়ে যাবে।

তার মানে এতকালের পৃথিবীর সবটাই কিছুকালের জন্যে জলের নিচে চলে যাবে। সে কি অতিকায় বন্যা ভাবাই যায় না। যদি কেউ বেঁচেও যায়—ধরা যাক টি ভি টাওয়ারে উঠে—সে কি একা এই এত দিনের সভ্যতার কথা মনে রেখে তার নিজের জীবনেই অন্য কাউকে গল্প বলে মনে রাখতে বলে যেতে পারবে? যদি অবশ্য সে আর একজন বেঁচে যায়। তবেই সে আরেক জনকে বলে যেতে পারবে—

(ক) জানিস এখানে আগে সিনেমা হোত।

(খ) ভুলিস না-মানুষ এইভাবে কাঁদতো। মনে রাখিস কিন্তু। এবার আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি।

(গ) জানিস তো—এই পৃথিবীতে দুই রকমের জন্তু ছিল। মানুষ আর মেয়েমানুষ। একজন আরেক জনকে ভালবাসতো। এই ছিল নিয়ম!

বীরেন ঠিক করলো, এখন থেকে সে পৃথিবীর গায়ে সব রকমের ফুটোর ওপর লক্ষ রাখবে। পারলে বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। ম্যানহোল-গুলোর কথা আলাদা। মানুষ পাতালের দিক থেকে নিজের বিপদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে কি করে যে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি করে। যেদিন সর্বাঙ্গে কাঁটা বসানো বিপদ স্বয়ং ম্যানহোল খোলা পেয়ে মাথা তুলে বেরিয়ে আসবে—সেদিন কালোয়ারের দোকানে কাঁচা লোহার ঢাকনা বিক্রির টাকা কি বাঁচাতে পারবে আমাদের ওই প্যালট্রি সাম? সমুৎপন্নে বলে কি একটা শ্লোক আছে না—

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। পাছে রাধার ঘুম ভাঙে—তাই রিসিভারটা ছুটে গিয়ে তুললো বীরেন। কিন্তু কানে দিতে সাহস হোল না তার।

আলগোছে কানের দিকটা নাকের কাছাকাছি নিয়ে এলো। যা ভেবেছিল তাই। ফট্টিসিক্স একসচেঞ্জের আণ্ডারগ্রাউণ্ড লাইনের সঙ্গে নিশ্চয় সুয়ারেজের লিকজায়গা জুড়ে গেছে। উঃ! কী বিচ্ছিরি গন্ধ। কেমন সন্দেহ হতে রিসিভারের কান দেবার জায়গাটা ভালো করে শুঁকলো বীরেন হ্যাঁ, খারাপ গন্ধ বটে। তবে সুয়ারেজের নয়। এ নিশ্চয় ছুঁচোদের কাণ্ড। রিসিভারটা টেবিলের উপর রেখে ঘরের এক কোনের নালির পাশে দাঁড়িয়ে গন্ধ টানলো বীরেন। ঠিকই ধরেছে। তরিতরকারির খোসা ডাস্টবিন থেকে টেনে এনে ছু চোরা এই নালির গোড়ায় জমিয়েছে। কয়েকদিন ধরে। তাদেরই পচা গন্ধ।

তাহলে ময়লা বোঝাই নালি একটাও ফুটো হয়নি এদিকে এখনো। হয়ে যাবে শীগগিরি। কেননা মেট্রো রেল তো আসলে কলকাতার পাতালটাকেই ভেঙে ফেলতে চায়। সে জন্যেই এত খোঁড়াখুঁড়ি। ঠিক সময়মত অজগর বেরিয়ে পড়বে। তখন আর কিছু করার থাকবে না। মাথার চুল ছিঁড়েও কিছু করা যাবে না।

টেবিলে শোয়ানো রিসিভারটা বেশ জোরে কড় কড় করে উঠলো। খুব সাবধানে সেটা কানে দিতেই স্পীডে খানিক গ্যাস বীরেনের কানে ঢুকে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে কালা করে দিল। গ্যাস

মেইনটাই লিক হয়েছে।

তখন ওপাশ দিয়ে সাইট ইঞ্জিনিয়ার বলছিল, এ কি ইয়ার্কি সাতসকালে ?—

ওঃ। আপনি বলুন।

ফোন হাতে নিয়ে চুপ করে ছিলেন কেন ?

শুনতে পাইনি।

আজ কিন্তু আপনি কটক যাচ্ছেন—

পাঁচ

মহানদীর ওপর ব্রীজে উঠে ট্রেন আর এগোচ্ছিল না। পুরনো পোল। ইঞ্জিন খুব সাবধানে এগোচ্ছিল। কাঠের কামরায় জানলা দিয়ে অনেকটা জ্যোৎস্না। বাকি জ্যোৎস্না মহানদীর ধূ ধূ বালির চড়ায় রাত আর নেই বলতে গেলে। ট্রেনটা থেমে গেল। ব্রিজের মাঝামাঝি। জানলা দিয়ে বীরেন দেখতে গেল বালির ওপর হাত দিয়ে চারটে গোল আধখানা করে লাইন টানা হয়েছে। সে-লাইনে সুন্দর করে প্রদীপ বসানো। কাল সন্ধ্যেরাতে এখানকার কারা যেন নদীকে সাজাতে এসেছিল। জায়গাটা রেল কামরার পাদানী থেকে বড়জোর দোতলা নিচে। কাছাকাছি সামান্য জল। সে-জল বালিয়াড়ির অনেকটাই ভিজিয়ে নরম করে রেখেছে।

ব্রিজের গায়ে কোন রেলিং নেই। নদীর একদিককার তীরের গাছপালা আবছা অন্ধকারে জড়াজড়ি করে দাঁড়ানো। বীরেন টুপ করে কামরা থেকে নেমে নড়বড়ে ব্রিজের সরু করিডরে দাঁড়ালো। আর অমনি ট্রেনটা ছেড়ে দিল। বীরেনের কামরা থেকে এক প্যাসেঞ্জার চোখ বড় বড় করে তাকালো। পুরীর বাঙালী উকিল। সে তো একাই চেঁচিয়ে মাৎ করার জোগাড়। উঠে আসুন। শীগগিরি উঠে আসুন।

বীরেনের হাত নেড়ে বিদায় জানাতে খুব ভাল লাগছিল। সে নিজে কোনদিন এরকম বিদায় জানায়নি। এখন খুব ভোরবেলা। পৃথিবীর

এক একটা জিনিস মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে। বীরেন বুঝলো, এই প্রথম সে তার নিজের জীবনে ফিরে যাচ্ছে। নয়তো আসলে তো সে এতকাল মৃত্যুর মত একটা জীবনে কাটিয়ে এসেছে। শেষ কামরার গার্ড বীরেনকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভূত দেখার মত উঠে দাঁড়ালো। হাতের সবুজ লাল কাঁচ লাগানো বাতিটাও খানিক উঠলো। সাউথ ইস্টার্ণে এখনো অনেক বাঙালী। কি হচ্ছে? অ্যাঁ? কী হচ্ছে ওটা—

কয়লার বিরাট ইঞ্জিন তখন ব্রিজ ছাড়িয়ে নিশ্চিন্ত মাটিতে পড়েই বেশ ফুর্তিতে ছুটতে শুরু করেছে। খুলনা জেলা স্কুলের গায়ের একজোড়া নদী—কিংবা একটাই নদী—খানিক ছেড়ে খানিক তফাতে তফাতে একই জলধারার দুই নাম। তাদের বুকের বালি দেখা যেত না। সে-নদীর চেয়ে এ-নদী বড়। তবে এর অনেকটাই বালির চড়া। দূরে যেখানটায় জল—তাতে কয়েকখানা ডিঙি।

এই আমার জীবন শুরু হোল। এই আমি জন্মালাম। নদীর এতখানি খোলা বুক। এত বিরাট এই আকাশ। তাতে রেলের ব্রিজটা কত বড়। আর আমি কিনা ভেবে আসছি—কলকাতার কি হবে? ভালবাসার কি হবে? পাতালের পোকাগুলো উঠে এলে কি হবে?

বীরেন নীচে জোলো জায়গা দেখে লাফ দিল। লিফটে উঁচু বাড়ি থেকে নামার সময় বুকের ভেতর যে ঝাকুনি হয়—তাই হোল এখন বীরেনের। একটু বেশি পরিমাণে। যত কম জল ভাবা গিয়েছিল ওপর থেকে—তার চেয়ে অনেক বেশি থাকায় বীরেন থেবড়ে গিয়ে পড়লো, গায়ে লাগলো না বিশেষ। কিন্তু নাকে ব্যথা পেলো। জল ঢুকে গিয়ে। আরও জল নাকে ঢুকিয়ে নিয়ে নাকের ব্যথা কমালো বীরেন। ধুতিটা সপ সপ করছে ভিজে। গায়ের কেম্ব্রিকের মোটা পাঞ্জাবীও ভিজে। এসব কোনদিকে নজর না দিয়ে বুক পকেট থেকে উড়ে পড়া দশ টাকা পাঁচ টাকার নোটগুলো জলের ওপর থেকে কুড়োতে হোল আগে। বড় করে সূর্য উঠছিল। পাতলা বাতাসে নুড়ি চাপা দিয়ে বালিতে নোট শুকোতে দিল বীরেন।

কাল রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে যারা কোন পুজো দিয়ে গেছে তারা এখন এলে দেখতে পেত নিভে যাওয়া প্রদীপের তেলে গুড়া বালি পড়ে কিচ কিচ করছে প্রদীপের খোল। মাটির তৈরি। রোদে শুকনো। তেল বলতে রেড়ি। তাতে পুরনো কাপড় ছিঁড়ে পাকানো সলতে। মাথা তুলে বীরেন দেখলো কাছে পিঠে কেউ নেই।

খানিকক্ষণের ভেতর সূর্যটা লাফিয়ে আকাশে দেখা দিতেই পায়ের নিচের বালি তেতে উঠতে লাগলো। একটু পরে বীরেন বুঝলো, সে তো এক ভীষণ বিবাদে পড়েছে। কোথাও ছায়া নেই। অচেনা জায়গা। নদীর গায়ে বসতিও নেই। শুধু রেলপোলের রোগা ছায়াটা একটু একটু করে জায়গা পাল্টাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর হই হই করে কয়েকখানা লরি এসে পড়লো। বালি তোলার লরি। সাত আটখানা। ঠিকেদারীর লরি হবে। তাদের লোকজন বীরেনকে দেখে অবাক। এরকম বাবু তো এখানে আসে না।

বীরেন খোঁজ খবর করে জানলো কাছাকাছি ভদ্দরলোক থাকবার জায়গা ব্রজরাজনগর। মাইল সাতেক হবে। সেখানকার সিমেন্ট কারখানার জন্যে এই বালি যাচ্ছে।

লরিওয়ালারাই বললো সারাদিন এখানে থাকলে বালুর তাঁতে সন্ধ্যে নাগাদ আপনি বাবু-রোস্ট হয়ে যাবেন। এখানে এলেন কি করে?

সত্যি কথাটা বলা যায় না। এখানে সব এত উদার। এত শক্তিশালী। কলকাতায় লালিত মানুষজন সুন্দর সুন্দর বলে খানিকক্ষণ প্রশংসা করতে পারে। কিন্তু থাকা সম্ভব নয় এখানে। সেই শক্তির সঞ্চয় নেই বারেনের মত মানুষের ভেতর।

লরিতে উঠে বেলাবেলি রওনা দিল বীরেন। বালি বোঝাই লরি ছায়া ঢাকা হাইওয়ে দিয়ে বিজিং বিজিং বিজিং বিজিং শব্দ করে যায়। মাথার ওপর রেনট্রি, ক্যাসিয়া গাছের ডালপালার জড়াজড়ি। ব্রজরাজ-নগর ঢোকার মুখে একটা শাদা বাড়ির সামনে বীরেন নেমে পড়লো। এখানে নামবেন? শহর কিন্তু এখনো দুমাইল।

ঠিক আছে। দেখতে দেখতে চলে যাবো।

লরিটা চলে যেতে বীরেন এসে শাদা বাড়িটার সামনে দাঁড়ালো। বাংলায় লেখা—পর্ণকুটীর। লরির ড্রাইভারের পাশে বসেই চোখে পড়েছে বীরেনের। এখন বেলা একটা। সারা রাস্তা ছায়ায় ছায়ায় নন্দকানন পাতলা মিষ্টি বাতাস। মহুয়ার গন্ধ-মাইলের পর মাইল। একজন হাটুরে ওড়িয়া যাচ্ছিল। খালি গা। পরনে ঠেঁটে ধুতি। গলায় মাদুলী। দুই বাহুতে চন্দন। চোখ কাজলের গর্তে বসানো। হাতে লম্বা বাঁশী। বীরেন তাকে থামালো।

চৌদুনী গাঁও কুঠে হবো ?

না বলি পারি। বলেই বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে লোকটা যেমন হাঁটছিল—হাঁটতে লাগলো।

বীরেন ভাবলো, কোথায় এখন নীলমণি পশুপতিদের খুঁজে পাই, আমি আর কটক অব্দি যেতে পারবো না। এদিকটা বোধহয় কটকেরই কাছাকাছি। কলকাতায় ফিরলে অফিস তো চেপে ধরবে।

সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে হবে। হাতে ঘড়ি নেই বীরেনের। রোদের তেজ। ছায়ার লম্বালম্বি দেখে মনে মনে আন্দাজ করলো বীরেন। পর্ণকুটীরের দরজা খুলে গেল। এক মাথা পাকাচুল নিয়ে একজন ধুতি পাঞ্জাবী বেরিয়ে এলো। পায়ে চামড়ার চপ্পল। চোখে রোদ-চশমা। হাতে ছড়ি।

ছায়া কেটে কেটে তাতে রোদের ছিঁটে—সারা হাইওয়ে জুড়ে ছড়ানো। সে রাস্তার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝেই লরি যাচ্ছিল। বিজিং। বিজিং। বিজিং।

স্যার। আপনি ধীরেন স্যার ? আমি দেখেই চিনেছি—

আপনি ? তুমি ?

আমি নাইন্টিন ফর্টিতে আপনার কাছে ভূগোল পড়েছি—খুলনা জেলা স্কুলে—

চিনলে কি করে আমায় ? এতদিন পরে ? আশ্চর্য।

আপনার ছবি দেখেছি অনেকবার কাগজে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের

কাছে চলে গেলেন। স্বাধীনতার পর পার্লামেন্টে গেলেন। সেন্টারে মন্ত্রী হলেন—

সে সব পর্ব অনেকদিন হোল চুকে গেছে। থাক। আজ আর হাঁটবো না। চলো ভেতরে যাবে—

ভেতরে গিয়ে অবাক হয়ে গেল বীরেন। এই জনমানবহীন জায়গায় সুন্দর একতলা বাংলো। ফুলের অঢেল আয়োজন। ফলের গাছ।

এটা সিমেন্ট কোম্পানীর গেস্ট হাউস ছিল। কিনে নিলাম। তখন নেহরুজী নেই।

ওঁর দফতরেই তো স্টেট মিনিষ্টার ছিলেন।

হ্যাঁ? এগারো বছর মন্ত্রী ছিলাম। সব সময় ভাবতাম—কবে রিটায়ার করে নির্জনে থাকবো।

ইলেকট্রিক পান কোত্থেকে এখানে?

সিমেন্ট কোম্পানীর ব্যাপার। মাটির নিচু দিয়ে কেবল টেনেছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বীরেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো। এখানেও আণ্ডারগ্রাউণ্ড? মুখে বললো কেবল ফলট হলে?

বড় একটা হয় না। হলে তিন চারদিনের ধাক্কা। খোড়াখুড়ি। তবে খুব অসুবিধে হয় না। আমি আর আমার স্ত্রী থাকি।

আপনার ছেলে?

একটিই। সে তো আজ বারো বছর—ভুবনেশ্বরে নার্সিং হোমে।

কি হয়েছে?

এমন সময় স্যারের স্ত্রী এলেন। পাকা চুল। লাল পাড় শাড়ি। পায়ে ঘাসের চটি। বড় করে সিঁদুর। তিনিই বললেন, শঙ্কর চিরকালই চপ কাটলেট খেতে ভালবাসতো। শান্তিনিকেতনে থাকতেও লুকিয়ে চুরিয়ে খেত। বড় হয়ে কলকাতায় হোস্টেলে থাকতে বেয়ারা দিয়ে আনাতো। পাশের দোকান থেকে। আ-ধোয়া স্যালাডে কী সব পোকা থাকতো। খেয়াল করেনি। একদম ব্রেনে চলে গেছে।

ধীরেন স্যার বললো, আজ বিশ বছর চিকিৎসা চলছে। কোন ফল হয়নি।

এখন কি অবস্থা ?

বারো বছর হয়ে গেল—পাকাপাকি নার্সিং হোমে। আমরা মাঝে মাঝে দেখতে যাই।

চিনতে পারে আপনাদের ?

সব সময় নয়। কখনো কখনো। ব্রেন অপারেশনের কথা হচ্ছে। ভিয়েনায় নিয়ে গিয়ে—

পড়ন্তি বিকেলের ছায়া লনে। তার সঙ্গে এই দুঃসংবাদ খাপ খাইয়ে নিল বীরেন। আমায় চিনতে পেরেছেন স্যার ?

না।

না পারারই কথা। আমারই তো এখন পঞ্চাশের দিকে।

তুমি কি ভৈরবের তীরে থাকতে। বেনেখামারের রাস্তায় ?

হ্যাঁ স্যার। একটি ছোট ছেলের কথা আবছা মনে পড়ছে। কিন্তু কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারছি না।

আমার ছেলেই স্যার এখন জিও-ফিজিক্স পড়ছে।

স্যারের বউ বললো, শঙ্কর সুস্থ থাকলে এতদিনে কবে বিয়ে দিয়ে দিতাম।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। সন্ধ্যের অনেক আগেই গোল করে চাঁদ উঠলো। সেই সঙ্গে গা ঠাণ্ডা করে দেওয়া বাতাস। বাতাসে অসংখ্য গাছপালার গা-ঢলানী শব্দ। একটানা।

স্যার বললো, পৃথিবী জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর বীরেন। গুরুদেবের জীবনে শেষবেলায় আমি শান্তিনিকেতনে যাই। এক একদিন গানে, জ্যোৎস্নায় গা ভিজে যেত।

মন্ত্রী থাকতে কেমন লাগতো আপনার ?

মন্দ না বীরেন। ভালোই। আর নেহরুজী আমায় খুব ভালবাসতেন।

রবীন্দ্রনাথও বাসতেন।

তাঁর স্নেহও পেয়েছি। আচ্ছা একটা কথা বলতে পারো। উইপোকা কীভাবে মারা যায়?

বীরেন দাঁড়িয়ে উঠে ফাঁকা জ্যোৎস্না ধোয়া লনে চেঁচিয়ে উঠলো। ও যায় না। উইপোকা মারা যায় না।

স্যারের চেয়েও তাঁর স্ত্রী বেশি অবাক হলেন। ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলেন কেন?

বীরেন হাপাচ্ছিল। আস্তে আস্তে বললো ওরা তো শত কোটী।

তবু কি ওষুধ নেই কোন?

ওষুধ কি আপনার ছেলের মাথার ভেতর থেকে পোকা বের করে আনতে পেরেছে?

ও তো মানুষের শরীর বীরেন। এ তো মাটি।

আরও জটিল শরীর স্যার। পৃথিবীর শরীর। না না গলিঘুঁজি। কোথায় যে বাসা বাঁধেনি ওরা।

ধীরেন স্যারের স্ত্রী বললো, সব কটা কাঠের জানলায় ফুটো করে যাচ্ছে। মেঝে খুঁড়ে ঝুরঝুরে মাটি করে দিচ্ছে। কেরোসিন ছিঁটিয়ে আগুন দিলাম। কিছুই হোল না।

এক কাজ করুন। ওদের বাসায় গর্ত খোঁড়ান লোক দিয়ে। আট-দশ হাত গর্ত। তারপর আগুন দিয়ে সব পোকা তাড়ান। শেষে পাবেন—রাণী পোকাটাকে। এই অ্যাতো বড়। সেটাকে গুলী করুন।

আলপিন ফোটান। যা ইচ্ছে করুন। কঠোর না হলে পারবেন না আপনারা।

আমরা তো বুড়োবুড়ি। এত পরিশ্রম। কে করবে!

ধীরেন স্যার তাঁর বউয়ের কথার পিঠে বললো, তার চেয়ে ফি-বছর জানলা দরজায় আলকাতরা মাখিয়ে যাবো।

সেই ভালো স্যার। ওরা আলকাতরা, কেরোসিনের গন্ধ সইতে পারে না।

জ্যোৎস্নার ভেতর ফুলগুলোর একদম খচিত অবস্থা। ফরসা লালচে

কানের লতিতে হীরের ফুল। সব কিছুই এখানে ছুরি বসানো। বাতাসটাই শুধু এলোমেলো। বীরেন বললো, স্যার। চৌতুনী নামে কোন গাঁও আছে কাছাকাছি?

ও নাম তো শুনিনি বীরেন।

ছয়

ধীরেন স্যারের ঘুম ভেঙে গেল বেশি রাতে। এমনিই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঘুম কমে আসে। তারপর আজ বিকেল থেকেই তিনি উত্তেজিত আছেন। যুবক বয়সে খুলনা জেলা স্কুলে পড়াতে ঢুকেছিলেন। সেদিনগুলো জীবন থেকে একদম মুছে গিয়েছিল। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে সেসব কথা মনে করিয়ে দিল তখনকার স্টুডেন্ট বীরেন। এর টাইটেলটাও জানা হয়নি। তখন ছিল আট ন বছরের বালক। এখন প্রায় পঞ্চাশের মধ্যবয়সী।

ছোট্ট শহর খুলনায় তুটো নদীর গায়ে স্কুল। হোস্টেল ছিল রূপসা নদীর তীরে। টিচার্স রুমের সামনে হরিতকি গাছ। পরে—অনেক পরে যখন ধীরেনবাবু ইউনাইটেড নেশনস্-এ যান—তখন সেখানেও ঢুকবার মুখে সাজানো লনে অমন একটি ছিমছাম সুন্দর গাছ দেখতে পান। নিশ্চয় হরিতকী নয়।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে ধীরেন স্যার দেখলো, আবছা লনে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুট করে বাইরের আলোটা জ্বেলেই অবাক। তুমি কি করছো ওখানে বীরেন? এত রাতে?

হাঁটুতে একটা ব্যথা পেয়েছি। হেঁটে ঠিক করে নিচ্ছি।

কখন পেলে?

আজই সকালে স্যার। মহানদীর ওপর ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিলাম। অন্তত তু'তিনতলা উঁচু হবে।

কি বলছো? সত্যি? তু'তিনতলা নয়। আট-দশ তলা হবে। তোমার লাংস্ যে ফেটে যায়নি—এটাই আশ্চর্য।

দিলাম।

তুমি অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ বীরেন। তোমার চেহারা আমার মনে নেই। মানুষ অল্প বয়সে একরকম থাকে। বড় হয়ে আরেক রকমের হয়ে যায়।

পোকাই সব পাল্টে দিচ্ছে স্যার। সারা পৃথিবীর মাটির ভেতরে মাটির শরীর স্বাস্থ্য রাখতে পোকারা মাটি তুলছে—গর্ত করছে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরেও আসছে।

তুমি এত পোকা-পোকা করছো কেন বীরেন? আমি—তুমি—আমরাও তো এই বাতাসে এরকমের পোকা। আমাদের শরীর আরেক রকমের পোকা কুরে কুরে খায়। শরীর কবরে দিলে এক বছরের ভেতর পোকা সবটা খেয়ে ফেলে হাড় ফেলে রেখে যায়। হাড়ও একদিন মাটিতে ক্যালসিয়াম হয়ে যায়।

নিশুতি রাত। সুন্দর বাতাস। তাতে অন্ধকার মাখানো বড় বড় ফুল। এর ভেতর দিয়ে বীরেন দত্তগুপ্ত তার প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার টিচারের সামনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। —আর কথা বলছিল। স্যারের প্রথম চাকরি খুলনা জেলা স্কুল। তারপর স্বাধীনতার আগেকার শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের কাছে। গুরু-দেবের জীবনে শেষ বছরটা হয়তো স্যার পেয়েছিল। তারপর এম পি হলেন। নেহরু নাম ধরে ডাকতেন। গান্ধীও তাই। সেকেণ্ড জেনারেল ইলেকশনের পর সেন্টারে মন্ত্রীও হলেন। আজ নিউইয়র্ক কাল জাকার্তা। পরশু পিকিং। চু-এন লাইয়ের সঙ্গে গাঁয়ের বাড়িতে বসে স্টিক দিয়ে এক সময় হয়তো সুইট অ্যাণ্ড সাওয়ার পর্ক খেয়েছেন, ক্রুশ্চফ নিজে ওকে হাত ধরে নিয়ে গেছেন সমাবেশের ইণ্ডিয় স্কেয়ারে। এসব ছবিই কাগজে বেরিয়েছে। বীরেনের চোখ এড়ায়নি। বীরেনের মুখে ফস করে এসে গেল একটা কথা। আপনি স্যার এখনো অনেকদিন থাকবেন। নিয়মে থেকেছেন চিরকাল। কিন্তু আপনা

বউকে নিয়ে কি করবেন?

ছ্যাখো বীরেন। এখন আমরা পাশাপাশি আছি। কতদিন থাকবো জানি না। মানুষের শেষের ইতিহাস শুধু সঙ্গী হারানোর ইতিহাস।

বলুন—অনন্ত নিঃসঙ্গতা।

ওটা কবিতার মত হয়ে যায় বলে ওভাবে আমি বলছি না বীরেন। একদা আমাদের মনে হোত—সামনে এখনো হাজার বছর পড়ে আছে। এখন আমি বুঝি—নতুনদের জন্যে এই পৃথিবীতে যে জায়গাটায় আছি—সেটা ছেড়ে দেওয়া দরকার। এই ট্রুথের পাশে ভালবাসা, বন্যা, ভূমিকম্প—যে কোন বিপর্যয়ই—সামান্য জিনিস। পর্বত, বৃক্ষ, নদীর ক্ষয় আছে—আর মানুষের ক্ষয় থাকবে না। হাজারিবাগ, যশিডি গিয়ে দেখো—এক সময়কার সব আনন্দ, হাসি, গানের বাড়ি—স্রেফ সাপের আড্ডা হয়ে পড়ে আছে। ভালবাসা তো আসলে একটা অতৃপ্ত দখলের ইতিহাস। না-পাওয়া অধিকারের অভিযান।

এ ছেঁদো দিকটা বোধহয়—ভালবাসার সঙ্গে শরীরটাকেও গুলিয়ে ফেলা।

ওটা শরীর থাকলে তবে ভালবাসা পায়ের নীচে মাটি পায় বীরেন।

ছ'জনেই থেমে গেল। কেননা দমকা বাতাসে এবাড়ির বাইরে হাইওয়ের ছ'দিকের ছায়া ধরা গাছগুলো মহানন্দে ছুলছে। শুকনো পাতা সারা রাস্তা ধরে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। বীরেনের মনে হচ্ছিল, হাইওয়ের ছ'ধারের গাছগুলো এই এখন—এইমাত্র সচল হয়ে উঠেছে। বয়স্ক সব গাছের শেকড় ওপড়ানোর আওয়াজ বাতাসকে ভরে দিচ্ছে। ওই সাইজের সব গাছ এখন সারারাত ধরে একটানা চলে কলকাতার দরজায় গিয়ে থামবে সকাল নাগাদ। মাঝখানে মাত্র একটি দিন। তার ভেতর কলকাতা ইভাকুরেই করতে পারলে ভালো। নয়তো সেদিনই আবার যখন রাত শুরু হয়ে যাবে—গাছগুলো তখন কলকাতার ওপর দিয়ে দাপিয়ে চলে যাবে। একেই পশুপতি-নীলমণি ওরা নেই। জলের লাইন, গ্যাসের লাইন, ইলেকট্রিকের তার—সব মিলে গিয়ে একাকার। হাজার কোটি পোকা ইলেকট্রিক শক খেয়ে ঝাঁঝড়ি ছাড়াই

যে-কোন ফুটো দিয়ে কলকাতায় ঢুকে পড়ছে। আর এই অবস্থায় এতদিনকার সব গাছ যখন একসঙ্গে কলকাতায় ঢুকতে থাকবে—তখন নির্জন নিশুতি রাত একটি মহানগর জুড়ে মানুষ—ঘরবাড়ি—আগাগোড়া থেতলে যাবার সাক্ষী হয়ে থাকবে।

বীরেন আস্তে আস্তে বললো, এতকাল পরে স্যার আমি আপনাকে শরীর দিয়েই চিনেছি। কিন্তু আমাকে তো আপনি কিছু দিয়েই চিনতে পারবেন না।

সম্ভবও নয় বীরেন। এখন এখানে তোমার বলার ভঙ্গীটাই সব। আমি এক একটা পিঁপড়েকে লক্ষ্য করি। একা একা বারান্দায় বসে দেখি—উইপোকার সারি চলেছে। ডিসিপ্লিণ্ড। ডিটারমিণ্ড সোলজারস্। আর মনে পড়ে যায়—আজকের টিকটিকি তো সেদিনকার অতিকায় সব প্রাণী।

ওদের প্রতিশোধের ধরণটা দেখুন স্যার। এখন সামনাসামনি না পেয়ে—আপনার ছেলের কেসটাই দেখুন।

হ্যাঁ। ব্রেনে ঢুকে বসে আছে। পোকাটা আশ্চর্য বুদ্ধিমান। এক্সরে-তে দেখা গেল ও ডান কানের ওপর আছে। সেইমত অঙ্ক করে একবার ব্রেন খোলা হোল। সারজন ঠিক করলেন—সন্না দিয়ে ওকে তুলে বাইরে নিয়ে আসবেন। যেই না ব্রেন খোলা—ও অমনি জায়গা পাল্টালো। মাথাটা খোলা অবস্থায়, ফিরে অঙ্ক কষা যায় না। আর সন্নার ডগা অতদূর পৌঁছায় না। ফলে সেবারের অপারেশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ঠিক এই সময় কলকাতার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ডিটেকটিভ ট্রেনিং কলেজের রিসেপ্সন করিডরে বসে ক'জন লোক কথা বলছিল। এখানেও নিশুতি রাত। আলো অন্ধকারের ফারাক বুঝতে—একফালি জ্যোৎস্না।

একজন বললো, এই জেনা—কলিকাতা আগে কত ভাল ছিল।

অন্যজন বললো, এখনো ভাল। কিন্তেক জায়গা বাদে। তুই মনে

করে ছাখ পট্টনায়ক—আজ যারা মস্তানি, জুলুম করে—তাদের বাবারা তো এমন করে নাই।

তখন বাঙ্গালীর চাকরি ছিল। এত্তেক বেকার ছিল না ঘরে ঘরে। ওরাই কেউ কেউ এখন মস্তান। চাকুরি নাই। কি করিবে? তাই চাঁদার নামে জুলুম।

একজনের নাম পশুপতি জেনা। অন্যজন নীলমণি পট্টনায়ক। এদের জন্ম কলকাতাতেই। জীবনে তিন চার বারের বেশি এরা কেউ বাপ পিতেমোর ভিটে চৌদ্বুনীতে যায়নি। বলা যায়—কলকাতাই এদের বারাণসী। কলকাতাই উত্তমাশা।

নিসপেক্‌টরবাবু আমাদের লইয়া আসিল। মস্তানরা পাইলে রেহাই দিত না। বাড়িওয়ালার লাগানো মস্তান।

কি আর হইত? ওদের বাবাদের নালিশ জানাইতাম।

ওরা বাবার কথা ভারি শুনে! নিসপেকটরবাবু আমাদের সন্ধান কর-ছিলেন—তাই আমাদের দেখিয়াই পাকড়াও। বড় আশ্চর্যের ইস্কুল এইটা।

এরা দেশে গেলে তবে নিজের ভাষায় কথা বলে। জন্ম ইস্তক কলকাতা—তাই মুখের ভাষাও কিছু জগা-খিচুড়ি। খাঁটি বাংলা বা খাঁটি ওড়িয়া—কোন ভাষাই ঠিক ঠিক আসে না ওদের মুখে।

ঘুপচি ঘরের বদলে ডিটেকটিভ ট্রেনিং কলেজের সরকারী ঘরে ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। ওরা এখন এই কলেজের অতিথি। ওদের বাকি লোকজন পাড়া ছাড়া হবার পর দেশে গেছে। ফিরে এলে সি আই টি-র নতুন থাকবার জায়গায় ভাল ঘর পাবে বলে কথা হয়েছে। কলকাতা রিপেয়ারে ওদের অভিজ্ঞতা খুবই দরকারী। সরকার তাই মনে করেন।

সুন্দর বাতাস বইছিল কলেজ লনে। কলকাতায় এত সুন্দর জায়গা আজকাল কম চোখে পড়ে। পশুপতি বা নীলমণির ভাল ঘুম হচ্ছিল না সুন্দর ঘরে! দু'জনই দেশের লোকের সঙ্গে পরিবার পাঠিয়েছে চৌদ্বুনীতে। দিনের বেলা যেখানে লোকজনের যাতায়াত—সেখানে

এখন সুন্দর জ্যোৎস্না—বাতাসে সামনের শিউলি গাছটার ঢলাঢলি। জেনা আর পট্টনায়ক দুজনই শুয়ে পড়েছিল। সুন্দর বাতাস পেয়ে উঠে বসেছে। এখন ওদের আলোচনা অন্য মোড় নিল। অনেকটা এই পথে—

আগে ছিল হগ্ সাহেবের পাইপ। ইট, চুন, সুরকির গাঁথুনী।

সে তো ঠাকুর্দার বাবার আমলে তৈরি।

আমার ঠাকুরর্দাও ইট বয় সেখানে।

তোর ঠাকুর্দা আমার ঠাকুর্দার চেয়ে বড় ছিল।

সে তো হবেই। আমি তোর চেয়ে বড় না পশুপতি।

আমার ঠাকুর্দা চিত্তরঞ্জনের আমলে লোহার পাইপ বসায়।

তাতে ছ'আনা রোজে আমার ঠাকুরর্দাও কাজ করেছে। তখন করপোরেশন এত্তে বড় ছিল না।

সে পাইপে বড় জং ধরে।

বিধানচন্দ্র শেষে বাহাত্তর ইঞ্চি বসাইলো। এই কথাটি বলেই নীলমণি পট্টনায়কের মনে হল—এত্তে বড় শহর—কিত্তে লোকজন—নগরীর আসল প্রাণ ভ্রমরা ওই তিন প্রকার পাইপে। বড় রহস্য আছে এই নগরীর পাতালে! সে রহস্যে এখন আমি আছি। তাতে আমার বাবা—তার বাবা—তার বাবাও ছিল। এ যেন রাজরাজড়ার ইতিহাস। এখন কলিকাতায় মানুষ মানুষকে খুন করে ম্যানহোলে ভরে দেয়। সেখানে পুলিশ কোন্ পথে তদন্ত করিবে—তা শিখাইবার ইস্কুল এই বাড়ি। আমরা পাকড়াও—কেনে আমরা পাতালের পথ চিনাইবো। তাই জামাইয়ের আদরে আমাদের রাখা।

কত রাত অব্দি দুজনে গল্প করেছিল—তা এখন মনে নেই। এখন সকাল সাড়ে আটটা। ভারতের ভাবী ডিটেকটিভদের মর্নিং ক্লাশ শুরু হয়েছে। ক্লাশ নিচ্ছিলেন কর্নেল ঘোষ। তিনিই এই কলেজের প্রিন্সিপাল। বেশি স্টুডেন্ট নয়। পনের ষোলজন।

আবছা গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল নীলমণিদের। পাশেই ক্লাশঘর। সেখানে কে যেন জোরে জোরে কথা বলছে।

কর্নেল ঘোষ তখন বলছিলেন রক্ত আর পানের পিচের পার্থক্য নিয়ে আমরা তিনদিন আলোচনা করেছি। এবার আমি নতুন একটি বিষয়ে বলবো। ক্রিমিনোলজির সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং অধ্যায়! হত্যা এবং আত্মহত্যা। অ্যাণ্ড দেয়ার ডিফারেন্স।

কে যেন ক্লাশঘরে এসে কী বলায় কর্নেল ঘোষ থেমে গেল। এই ঘোষবাবুর গলা নীলমণিরা চেনে। ইনিই গত দু তিন দিন ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার পাতালের কথা ওদের কাছে জেনে নিচ্ছেন। একবার গাড়ি করে পশুপতিদের নিয়ে সাইটেও গেছেন। ফিতে ফেলে ম্যানহোলের ঘের মেপেছেন বার দুই।

ঘোষ সাহেবের গলা ভেসে এলো, দেখে আসিতো। কি করছে?

সারা ক্লাশ কর্নেল ঘোষের পেছন পেছন। প্রায় বিশজনের চল্লিশখানা জুতোর খট খট খট। পরিষ্কার সুন্দর মেঝের ওপর দিয়ে। সরকারী বাড়ি। লম্বাই চওড়াই। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। সামনেই খেলার মাঠ। ফুলগাছ। ছায়া দেবার বড় ঝাঁকড়া গাছ। জুতোগুলোর আওয়াজ ড্রাম পেটানোর নিয়মিত তালে পড়ছিল। সবুজ খেলার মাঠে তখন একজন মাত্র উরর্দি পরা গুর্খা। সে বিউগিলটা নিজের ঠোঁটে বসাচ্ছিল।

নীলমণি পট্টনায়ক পশুপতি জেনাকে বললো, চল পশু—মনে ভাল নেয় না।

ওরা দুজন যখন উঠে গিয়ে নিজেদের ঘরের সামনের পরিষ্কার বারান্দায় বসলো তখন জুতোর আওয়াজ থেমেছে।

কর্নেল ঘোষের কড়া গলা পাওয়া গেল। 'মিস্টার সাংমা। কাম আউট! বেরিয়ে এসো। এটা একটা কলেজ।

সরকারের শিক্ষানবীশ ভাবী গোয়েন্দারা চোখ বড় বড় করে তাকালো। তাদেরই সঙ্গী—নাগাল্যাণ্ডের ডগলাস সাংমা কমিউনিটি বাথরুমের বিরাট চৌবাচ্চায় গলা অবদি ডুবিয়ে ভেসে আছে। ওড়িশা, আসাম,

ওয়েস্টবেঙ্গল, বিহার, অরুণাচল, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড থেকে পাঠানো পুলিশ-এর বাছাই লোকজনকে—এখানে গোয়েন্দার কাজে ট্রেনিং দেওয়া হয়। ডগলাস সাংমা আজ তিন হপ্তা হোল কলেজে নানা খেলা দেখাচ্ছে। কর্নেল ঘোষ জীবন শুরু করেছিলেন ফৌজে। সেখানকার ফৌজী গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তাকে আনা হয়েছে। জোরে কথা বললে ঘোষের গলা থেকে বাঘ ডাকে।

এখানে সকাল থেকে বেলা বারোটা অবদি ক্লাশ। তারপর খাওয়া দাওয়া। আবার বেলা আড়াইটে অবদি ক্লাশ। কর্নেল ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলেন। বেরিয়ে এসো। তুমি আজ তিনদিন কোন ক্লাশে যাচ্ছো না।

চৌবাচ্চা থেকে কোন জবাব. এলো না। শুধু বাঁ পা জলের ওপর দাপিয়ে কিছু জল ছিটিয়ে দিল সাংমা। কর্নেল ঘোষ পিছিয়ে এলেন। তার আর্মি গোঁফেও সাংমার পায়ে ছিটানো দু ফোটা জল এসে লাগলো। তিনি রাগে গরগর করতে করতে বললেন, তুমি তিনদিন ব্যালিস্টিকের ক্লাশে যাওনি। সেরোলজির ক্লাশে ইউ ডিড নট আনসার ইওর প্রফেসর।

সাংমা চৌবাচ্চায় শুয়ে শুয়ে যা বললো বাংলায় তা অনেকটা এরকম—সেরোলজি মানে ব্লাড। খুন। রক্ত। আমি জানি হোয়াট ইজ রক্ত। কিন্তু প্রফেসর রক্ত দেখেনি কোনদিন। খুন দেখেনি। অথচ রক্তের কথা বলে যাচ্ছিল। আমি এরকম মূঢ় টিচারের কোশ্চেনে কি জবাব দেব ?

এটা শুধু রক্ত নয় সাংমা। এটা একটা বিজ্ঞান। দেশের ফিউচার ডিটেকটিভদের জন্যে এটা একটা কোর্স। পানের পিক আর রক্তের ডিফারেন্স জানতে হবে। জানতে হবে—জানতে হবে।

ধমকে উঠলো সাংমা। শাট আপ। উই হিলমেন—উই ডোণ্ট চিউ। আমরা পান চিবোই না। আমরা পাহাড়ের লোক।

শীতকালে শুয়োর জবাই করলে আমরা রক্তটা জমিয়ে রাখি। রক্তের কেক খাই। আমাকে আপনারা রক্ত শেখাতে আসবেন না। আই অ্যাম বিস্ট। ইউ আর এ সিভিলাইজড্ বিস্ট।

কাম আউট। বলে যেই না কর্নেল ঘোষ এগিয়ে গেল—অমনি সাংমা চৌবাচ্চা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর যা বললো, তার বাংলা—আমি ন্যাংটো। কাছে এসো না।

আমি তোমায় কোর্ট মারশাল করবো। আধ ঘণ্টার ভেতর ড্রেসড্ হয়ে আমার ক্লাশে আসবে।

ছাত্রদের নিয়ে গটগট করে আবার ক্লাশে ফিরে গেলেন কর্নেল ঘোষ। এক-একজন স্টুডেন্ট—এক-একরকম মত দিল। কেউ বলল—সাংমা অদ্ভুত। কেউ বললো পাগল। কেউবা বললো—বুনো।

কাঁটায় কাঁটায় তিরিশ মিনিটের মাথায় ডগলাস সাংমা কর্নের ঘোষের ক্লাশে গিয়ে হাজির। পা থেকে মাথা অব্দি সুসজ্জিত। নিখুঁত করে মাথা আঁচড়ানো।

ক্লাশে না এসে চৌবাচ্চায় নেমেছিলে কেন?

বিচ্ছিরি গরম।

গরম কোথায় নেই। সব জায়গায় গরম।

না। সব জায়গা গরম নয়। আমাদের দেশ এখনো ঠাণ্ডা।

এটাও তোমার দেশ সাংমা।

এত হট? এ আমার দেশ নয় কর্নেল।

ভেবেচিন্তে কথা বলো সাংমা। তোমাকে তোমার স্টেট গভর্নমেণ্ট নোমিনেট করে এখানে পাঠিয়েছেন।

আমি আসতে চাইনি।

তবে এলে কেন?

ওরা বললো, কলকাতায় খুব সুন্দর ঝর্ণা আছে। পাহাড় আছে কলকাতায়। বিশাল জঙ্গল আছে—

কর্নেল ঘোষ আকাশ থেকে পড়লেন। এসব? কলকাতায়?

নো নো কর্নেল। সবই ব্লাফ। টু ব্লাফ দিস হাম্বেল সোল। কত আশা

নিয়ে এসেছিলাম। এখানে ট্যাপ ওয়াটার আমার ঘেন্না করে। গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে এখানে কোন রাস্তা নেই। যে-রাস্তা দিয়ে কয়েক মাইল দৌড়ে যেতে পারি। দৌড়বার সময় পাখির ঝাঁক ছররা হয়ে উড়ে যাবে। বেজি বা খোরগোস ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতর পেলেও আমি গুলি করবো না। তখন যে খেলার সময়। তখন যে গাছের ছায়া মাটির সঙ্গে গা ঘসে।

কিন্তু, তুমি এ-দেশের ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক সাংমা। তুমি স্টেট পুলিশে সাব ইন্সপেক্টর হবে। সামনে তোমার উন্নতির খোলা রাস্তা পড়ে রয়েছে।

হ্যাঙ ইওর সাব-ইন্সপেকটর। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড পড়ে পড়ে আমি সব গুলিয়ে ফেলছি। আমাদের দেশের গাছপালা, শীত, খরগোস, পাহাড়ী গাই—তার সুন্দর চোখ—সব আমি ভুলে যাচ্ছি। এই বইটা পড়লে কোন মানুষ আর মানুষ থাকে না।

ক্লাশে অন্য ছাত্রদের সামনে নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে শেষ চেষ্টা করলেন কর্নেল ঘোষ। কি বলছো সাংমা? ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড মেকলের ব্রেইন চাইল্ড। কতদিনকার আইন—অথচ এখনো সমান তেজী।

বাজে কথা, মেকলে কবেকার জানি না। কিন্তু আমাদের পাহাড়ের হাজার হাজার বছরের আইন—তার কি কোন তুলনা হয় কর্নেল। তোমাদের এ-আইনে কোন ভাল শাস্তি নেই। কোন ক্ষমা নেই। খুন কত রকমের। আমাদের জবাই একটাই।

কি রকম?

খুন। খুনে সাহায্য করা। খুন করতে উত্তেজিত করা। কত কি। সব গুলিয়ে যায় আমার।

কোর্ট মার্শালের জন্য তৈরী হও।

আমি যে-কোন অবস্থার জন্যে তৈরি কর্নেল।

বেলা তিনটার সময় দেখা গেল—ডগলাস সাংমা ট্রেণিং কলেজের

ঘেরা খেলার মাঠে স্কুল ইউনিফর্ম পরে জগিং করছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। সারা মাঠে একা। রোদ্দুর তখন মন দিয়ে ঘাস ভাজা করে যাচ্ছে। সাংমার পিঠে অনেকটা বোঝা। ওর তুপাশে একজন করে সেন্ট্রি। তাদের কাঁধে খোলা সঙ্গীনের বন্দুক? আর অভিবাদন মঞ্চে বিরাট এক ছাতার নিচে কর্নেল ঘোষ বসে।

কর্নেল তুবার ডাবল্ আপ করিয়ে সাংমাকে স্যালুট স্ট্যাণ্ডের কাছে নিয়ে এলো। সাংমার ভ্রূ নোনা ঘামে ভিজে গেছে। সে অবস্থায় কর্নেল বললো, তুমি তোমার শোবার ঘরে একটা বড় টিকটিকিকে ডিকসনারি ছুড়ে সিলিং থেকে নিচে ফেলে দিলে।

আমাদের হাতের টিপ অব্যর্থ।

যা জানতে চাই তাই বলো। টিকটিকিটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে তুমি সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে ভেজে খেয়েছো?

ওটা আমাদের দেশে সুখাদ্য।

তোমাকে স্টোভ দেওয়া হয়েছে—তোমার ঘরে বসে তুমি যাতে ব্রেকফাস্ট করে নিতে পারো—সেজন্যে।

টিকটিকি আমরা অনেক সময় ব্রেকফাস্টেও খাই। আবার লাঞ্চেও খাই। আসলে আমাদের খাওয়া দাওয়ার কোন মাপা সময় নেই। খিদে পেলেই আমরা খাই। পাহাড় আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছে। গাছ আমাদের বন্ধু। নদী আমার দেশের হরিণ। তোমার কলকাতার এসব কিছুই নেই। ব্যারন—

ডাবল-আপ।

ডগলাস সাংমা আবার দৌড়তে লাগলো। সারা মাঠ এক চক্কর দিয়ে আসার পর কর্নেল আবার মুখ খুললো, তোমাকে ডিকসনারি দেওয়া হয়েছে—পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে। ডিকসনারির তুমি অপমান করেছো। বইকে তুমি প্রোজেক্টাইল হিসেবে ব্যবহার করেছো।

হাতের কাছে হ্যাণ্ডি অন্য আর কিছু ছিল না। প্রোজেক্টাইল ক্লাশ নেওয়ার সময় আপনাকে আমি বলেছিলাম—আমার নিশানা কখনো ভুল হয় না। মিস করে না। আশা করি এটাই তার প্রমাণ।

আমি ভেবেছিলাম—এই অব্যর্থ টিপের জন্য আমি আপনার কাছ থেকে কোন রিওয়ার্ড পাবো।

স্যার আপনার ফোন।

স্যালুট স্ট্যাণ্ড থেকে নেমে পাশেই ক্লাশ-রুমের লাগোয়া করিডরে টেলিফোন।

হ্যালো ?

কে ? বড়মামা—

কাকে চান ?

কর্নেল ঘোষ আছেন ?

বলছি।

আমি রাধা বড়মামা—

কাঁদছিস কেন ? কি হয়েছে ?

তোমার জামাই—আজ দশদিন হলো কটক গেছে। অফিসের কাজে। ফেরেনি। তাকে নাকি লাস্ট দেখা গেছে—মহানদীর ওপর রেল ব্রিজে। অফিস তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কটক পুলিশ কিছু বলতে পারছে না।

চলে আয়। কি করতে পারি দেখি।

তুমি আছো ?

তোর জন্যে ওয়েট করবো। সন্ধ্যে নাগাদ আয়। গেটে এসে সেন্ট্রিকে বলবি—আমার নাম—

কর্নেল আবার বড় ছাতার নিচে ফিরে গেল। তার জেদ বেড়েই যাচ্ছে। কি করে এই অবসটিনেট ইয়ংম্যানকে কাবু করা যায়—তাই ভাবছিল কর্নেল। কিছুতেই জব্দ হওয়ার পাত্তর নয়।

ডগলাস সাংমা। মন দিয়ে শোন। তুমি লাইভ কার্টিজ বিনা পারমিশনে ইউজ করেছো।

আমি তো কাউকে গুলি করিনি। আমরা পাহাড়িরা অকারণে গুলি খরচ করি না।

তুমি জ্যান্ত টোটা ছুঁড়ে কলেজ কম্পাউণ্ডে পায়রা ধরেছো।

আমি আস্ত ছুড়ে মেরেছি। রাইফেলে ব্যবহার করিনি। এটাও আশা করি কর্নেল—আপনি লক্ষ্য করেছেন—ব্যালিস্টিকসের মডেল স্টুডেন্ট হবার যোগ্যতা আমারই আছে। পায়রাগুলো কলেজ-কম্পাউণ্ডে খেলছিল। আমি ওয়েপনস্ সাফ করছিলাম বসে বসে। একটা তাজা কার্তুজ ছুঁড়ে হেলদি বার্ড ঘায়েল করলাম—

চুপকরো। তাকে আহত অবস্থায় ধরে এনে তার পাখনা কেটেছো।

ইয়েস কর্নেল। পাখনা ক্লিপ করে তাকে আধো-ভেজানো ড্রয়ারে রেখেছি। তার একটা কারণ আছে।

কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। পড়াশুনোর টেবিলের ড্রয়ারে পায়রা। আহত পায়রা। তার পাখনা তুমি ছেঁটে দিয়েছো—

কারণ—তখন তখনই আমার খিদে ছিল না। তাই পায়রাটা আমি স্টোর করেছিলাম। পরে খাবো বলে।

তোমার ড্রয়ারে সেই পায়রা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোর্ডের ওপর সারাদিন ধরে হেগেছে—

তা করতে পারে। আমার তো মনে ছিল না যে—ওই রাবিশ বইটা ওখানে রয়েছে।

তুমি আমাদের আইন ব্যবস্থাকে অপমান করেছো।

যে-আইন আমি গ্রাহ্য করি না—তাকে কি করে অপমান করবো। অপমান তো ভালবাসার লোককে করা যায়।

অ্যাবাউট টার্ন। ডাবল্-আপ।

ডগলাস সাংমা পেছন ফিরে দৌড়চ্ছে। পিঠের বোঝাটা দুলছে। কড়া রোদ্দুরে সারা ইউনিফর্ম ঘামে ভিজে এখন প্রায় কালো।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে দরবার প্যারেডের ঢাউস ছাতার নিচে অস্থির

হয়ে পায়ের অ্যামুনিশন বুট সিমেন্ট করা স্যালুট স্ট্যাণ্ডে কিচ-কিচ করে ঘষতে লাগলো। আর মুখে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো—

ভালবাসা। ভালবাসা।

তারপর কর্নেল নিজের মনে মনে বলে ফেললো, খুন করার বেস্ট ওয়েপন—ভালবাসা।

বলেই কর্নেল অবাক হোল। এ আমি কি বললাম ?

রাধা এসে তার বড়মামার কোয়ার্টারের বারান্দায় বসলো। কলেজ কম্পাউণ্ডেই সরকারি বাড়ি। ঢাকা বারান্দার দেওয়ালে বড় মামীমার ছবি। ছবির নিচেই জুতোর র‍্যাক। র‍্যাকের এক কোণে আধপোড়া ভাঙা ধূপকাঠি। সেন্ট্রি এসে বললো, সাহেব বাথরুমে। চা, না কফি ?

এখন কিছু খাবো না।

খানিক বাদে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়সের খালি গা, চান—সারা পেটা শরীরের বড়মামা বেরিয়ে এলো। বড় আলোটা জ্বেলে দি।

দাও।

কি হয়েছিল তোদের ?

কিছু না বড়মামা। একটু বুড়িং টাইপের ও—সে তো তুমি জানোই।

গ্যাখ রাধা। একটা কথা বলি। এই বয়সের লোক হারায় না। হয় খুন হয়। নয় নিজেই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যায়।

তুমি ওর ডাইরিটা পড়ে দেখতে পারো।

এনেছিস্।

হ্যাঁ।

ভ্যালো করেছিস ? তুই নিজে পড়েছিস্ ?

না। কুটি-কুটি করে লেখা। আমি পড়তে পারিনি সব।

আমি পেরে যাবো। হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট ছিলাম প্রথম জীবনে। ওটা রেখে দে। আগে তোর সঙ্গে কথা বলি।

কটক পুলিশ—

থামতো। পুলিশের আমি সব জানি। তোর সঙ্গে কিছু হয়েছিল ?

নাঃ। সবই নরম্যাল।

অফিসে ?

সেখানে সুনাম নিয়ে কাজ করে আসছে তোমার জামাই।

জানিস তো রাগ ভাল নয়। ভালবাসা থাকলেই অপমান করা যায়। এই লেসনটা আজ পেলাম। একটা কথা মনে রাখবি রাধা—আমাদের বংশের—তুইও ভাগিনী হিসেবে সে-রক্ত খানিকটা পেয়েছিল—তাছাড়া সেরোলজি পড়াতে গিয়ে জানছি—রক্তের একটা ছাপ থাকবেই—

আমরা সবাই গুপ্ত পাগল।

রাধা নিজের মনেই শিউরে উঠলো। আমি পাগল ? অথচ আমি তা জানি না। সে তো আরও সর্বনেশে কথা।

কর্নেল নিজের তোড়েই কথা বলে যাচ্ছিল। তার বারান্দা থেকে কলেজ গ্রাউণ্ড আস্ত একখানা অন্ধকার। তার ভেতর রোদ্দুর পোড়া মাঠটার সবুজ এখন মিশে আছে। সাংমা নাকি ডারমিটারিতে ফিরে গরম জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। ওর পড়াশুনোর বাকি ড্রয়ারগুলোতে যা পাওয়া গিয়েছে—তা হোল—কাচালঙ্কা, ছুরি, গোলমরিচ, নুন আর জুরিসপ্রুডেন্সের একখানা ছেঁড়া বই।

কর্নেল উঠে গিয়ে ঘর থেকে অফিস ক্লিনিককে ফোন করলো। ডরমিটরির দশনম্বর সিটে লোশন, ট্যাবলেট, ক্রিম প্লাস্টার—যা

দরকার পাঠিয়ে দাও। আমি সই করে দেব কম্পাউডারকে বললো, সাংমা কেমন থাকে আমায় জানাবে।

বারান্দায় ফিরে এসে কর্নেল ঘোষ রাধাকে বললো নয়তো ছাখ— সামান্য ঝগড়া থেকে কী দাঁড়ালো। তোর মামীমা একদম চিরকালের জন্যে চলে গেল। আমি আজ সতেরো বৎসর এই ফাঁকা বাড়ীতে প্রিন্সিপাল হয়ে কোয়ার্টার আগলাচ্ছি।

কেন? মেয়ে জামাই আসে না?

একদিন দিব্যি বসে বসে দীপেন আর সতীর সঙ্গে গল্প করছি। সামান্য ঠাট্টা থেকে কথা কাটাকাটি। রাগের মাথায় রাত-দুপুরে ওদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি।

তারপর? এ কাণ্ড কবে করলে?

দু বছর হোল। দীপেন সেই যে বদলি হয়ে আসানসোল—তারপর ওরা কলকাতায় এলেও এদিক মাড়ায় না। তাই বলছিলাম—আমাদের ফ্যামেলিতে আমরা সবাই গুপ্তপাগল। আমরা তা জানি না। মাত্র বছর দশেক হোল জানতে পেরেছি আমি।

তাও সাবধান হও না কেন?

দে। বীরেনের ডাইরিটা দে—। আর ঘরের ভেতরের ওই টেবিলটা থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা এনে দে।

রাধা তার কথার জবাব না পেয়ে পড়বার কাচ এনে দিল। ট্রেনিং কলেজ। তায় পুলিশের ভাবী গোয়েন্দাদের—তাই গোলমাল ভর্তি

কলকাতার গায়ে একদম নির্জন এক ভূতুড়ে বাড়ি। চলাফেরা চুপচাপ।
দূরে শুধু ঠাকুরদের রান্নাঘর থেকে একটু আধটু যা আওয়াজ আসছে।

পড়তে পড়তে মামা তার ভাগ্নীর কাছে জানতে চাইলো, জঁা পল সাত্রে কে? নামটা শোনা শোনা লাগছে। তাকেই তো এখানে চিঠি লিখে রেখেছে বীরেন।

একজন লেখক। একটা ইংরিজি বই দেখেছিলাম একদিন ওর টেবিলে। তাতে এরকম একটা নাম ছিল।

ও হ্যাঁ। এ নাম আমার শোনা। ইংরিজিতে বই দেখেছি। বলতে বলতে কর্ণেল ঘোষ বীরেনের লেখায় ডুবে গেল।

প্রিয় শ্রীযুক্ত জঁা পল সার্ত্রে,

ভালবাসা, বাঁচিয়া থাকা এবং টিকিয়া থাকার বিপদের সামনে দাঁড়াইয়া আজ আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি। আমি আপনার তিনটি গল্প মাত্র পেপার ব্যাকে পড়িয়াছি। আর পড়িয়াছি—একটি ট্রিলজি উপন্যাসের মধ্যে একখানি উপন্যাসের প্রথম সত্তর পৃষ্ঠা।—যেখানে আপনি প্যারি শহরে একটি নিম্নবিত্ত কুমারীর মাতৃসম্ভাবনা লইয়া ভাবিত।

তাহাকে কি করিয়া খালাশ করা যায়—এবং সে ব্যাপারে এক বুড়ির পরামর্শ আপনি যেভাবে গুছাইয়া বলিয়াছেন—তাহাতে মনে হয়—আপনি একজন ফরাসী গৃহস্থ মানুষ।

আমি একজন বাঙ্গালী গৃহস্থ। আমার বাঁচিয়া থাকাই মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। আমি আপনার সৎ পরামর্শ চাই। তার আগে একটি কথা। আপনি কি আমাদের এখানকার গৃহস্থদের মতই ভাড়া বাড়ির বাসিন্দা?

সে যাক!

আমি স্থির নিশ্চিত যে, অল্প দিনের ভিতরেই কলিকাতা শহরের পাতালের সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আমাদের এই পাতালের ইতিহাস যাহাদের মুখস্থ—তাহারাই নিখোঁজ। বংশ পরম্পরায় কিছু লোক কলিকাতার পাতাল সারাইয়া সাজাইয়া আসিতেছে। সেখানকার মানচিত্র মাত্র কিছু লোকের মাথায় আছে। এই অবস্থা শতাধিক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃত অবস্থা—মহানগরীর পাতালের কাঠামো মাথায় রাখিয়া আজ সেই লোকগুলি উধাও। পাড়ার বেকাররা বাড়িওয়ালার পয়সা খাইয়া তাহাদের উৎখাত করিয়াছে। আমি তাহাদের খুঁজিতে যাইতেছি।

যদি উহাদের না পাই—তাহা হইলে কলিকাতার ভূগর্ভে পাতাল রেলের নিঃশ্বাস টানার পথের সঙ্গে গ্যাস, আলো, ইলেকট্রিক-এর এবং পয়ঃপ্রণালীর প্রলয়ঙ্কর জগাখিচুড়ি অতি সত্বর বাঁধিবেই বাঁধিবে।

এখন আপনি অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন। আমাদের একমেব গঙ্গা এখন বুজিয়া আসার জোগাড়। আকাশে গ্যাসালিন ডিজেল কয়লা আর কারখানার ধোঁয়া নগরীর মাথার উপর সর্বদা একটি অন্ধকার বলয় ভাসাইয়া রাখিয়াছে। কাশিলে আমাদের লাংস ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠে। এই পরিস্থিতিতে পিচরাস্তা আর ফুটপাথের মলাটের মোড়কের তলাতেই সেই ভয়ঙ্কর জগাখিচুড়ি ঘটিলে কি দাঁড়াইবে তাহা আমি ভাবিতে পারিতেছি না।

প্রথমেই পাতালবাসী শত শত কোটি পোকা বাহির হইয়া আসিতে থাকিবে। কীট-বন্যা কেহ দেখে নাই। কিন্তু কলিকাতায় তাহা

আসন্ন। হাজার হাজার টন পোকার ওজনের নীচে কলিকাতার ঘরবাড়ি, মানুষজন, স্মৃতিসৌধ ও মিউজিয়ম একদম থ্যাতলাইয়া গুড়াইয়া যাইবে। আমি বলিব পোকার সেই প্লাবন নোয়ার প্লাবনের চাইতেও ভয়ঙ্কর। কারণ জল সরিয়া যায়—জল বহিয়া যায়। কিন্তু পোকা নড়িয়া চড়িয়া জায়গা বদলাইয়া আরেক জায়গায় গিয়া বসিয়া পড়ে। নড়ে না চড়ে না।

ভূ-গর্ভের মানচিত্র মাথায় রাখিয়া যাহারা বংশপরম্পরায় বছরের পর বছর পাতালের গ্যাস, আলো, টেলিফোন, পয়ঃ-প্রণালী ঠিক রাখিয়া আসিতেছিল—তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। কারণ এই নগরীতে ভাড়াবাড়িতে আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া আমি ও আমার স্ত্রীও বাস করি। রাধা এখনো বোঝে নাই—কী বিরাট বিপদ আমাদের সামনে। সে কয়েকটি আরসোলার আর চারটি ছুচোকে এখনো বিষ দিয়া সাবাড় করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে যে সে নিজে সাবাড় হইবে সে কথা এখন বলিলেও বিশ্বাস করিবে না।

এই রাধাই সাঁর্ত্রে মশাই আমার বুকে একটি স্থায়ী ব্যথার কারণ। সে আমাকে যে ভালবাসা বাসে তার পায়ের নিচের ভিত শরীর। তার শরীরের কোষগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে সন্তুষ্ট না হইলে তার প্রতি আমার যতই ভালবাসা থাকুক না কেন—সব মিথ্যা হইয়া যায়। তাই তার কোষের তৃপ্তি পূরণে আমি শরীরে লিপ্ত হইয়াও নির্লিপ্ত থাকি। জীবনের বড় অঙ্কগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তখনই কষিতে শুরু করিয়া দিই। মাথার ভিতরে অনর্গল সিঁড়িভাঙ্গার অঙ্ক চলিতে থাকে। এক একদিন চৌবাচ্চার অঙ্ককে বাছিয়া লই। তখন রাধার

গায়ে থাকিয়াও আমি আসলে পাটিগণিত, বীজগণিতে বাস করি। এই আমার ভালবাসা। আমার উত্তেজনা, সংশয়, আকর্ষণ এক ব্যাকরণ কৌমুদীর ধাতুরূপ। অথচ খুলনা জেলা স্কুলে কত আনন্দে ধাতুরূপ শব্দরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলাম।

আপনিই বলুন—এবার কি আমার সংশয়গুলি অকারণ? আমার বিশ্বাসমত আপনাকে সব লিখিলাম। আপনার মূল লেখা ফরাসী রচনা আমি পড়ি নাই। ইংরাজিতে যতটুকু জানিয়াছি—তাহাতে আপনাকে নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা বলিয়াই মনে হয়। তাই এই পরামর্শ প্রার্থনা, আমি কি করিব বলিয়া দিন। এ ব্যাপারে অন্য কোন সৎ পরামর্শদাতাকে কাছেপিঠে দেখিতেছি না।

আমার অস্তিত্বের এই বিপদ আপনিই বুঝিবেন। মহানগরীর শিকড় পাতালে। সে পাতাল টলোমলো। শরীর ও সভ্যতার যাবতীয় পোকা প্লাবনের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। ভালবাসা জানিতাম স্বয়ম্ভু। শরীরকে বাধা এই ভালবাসার ভিত বানাইয়াছে। পরিণামে আমি সদাসর্বদা বুকে ব্যথা অনুভব করি। পড়শী নদীটি বুজিয়া যাইতেছে। মাথার উপর আকাশ ধোঁয়ার বলয় ভাসাইয়া থম মারিয়া আছে। কাশিলে ফুসফুস ঝনঝন করিয়া বাজিয়া ওঠে। দম কমিয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায়—

কর্নেল ঘোষের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি ভাগ্নীর দিকে জামাইয়ের

ডাইরি এগিয়ে দিলেন আর পড়তে পারছি না রাধা। চোখ ব্যথা করছে।

কি বুঝলে মামা?

এ নিজে না ফিরলে কে ফেরাবে এঁকে।
